# তিতুমীর।

বা

## নারকেলবেড়িয়ার লড়াই।

শ্রীবিহারিলাল সরকার কর্ত্তৃক
সঙ্কলিত।

কলিকাতা
২৩ নং যুগলকিশোর দাসের লেনে
কালিকা-যন্ত্রে
শ্রীশরচ্চন্দ্র চক্রবর্ত্তী কর্ত্তৃক
মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

১৩০৪ সাল।

[ 'তিতুমীর'-এর প্রথম সংস্করণের আখ্যাপত্র ]

# উৎসর্গ

শ্রীযুক্ত যোগেন্দ্রচন্দ্র বসু মহাশয়কে

এই গ্রন্থ

কৃতজ্ঞতা চিহ্ন-স্বরূপ ভক্তিসহকারে

উৎসর্গ করিলাম।

## কৈফিয়ৎ

তিতুমীর বঙ্গবাসীতে প্রকাশিত হইয়াছিল। পুনরায় পুস্তকাকারে প্রকাশিত হইল কেন? পুস্তকাকারে প্রকাশ করিবার তিনটি কারণ। প্রথম কারণ,—অনেকের অনুরোধ; দ্বিতীয় কারণ,—অনেক কথা বঙ্গবাসীতে প্রকাশিত হয় নাই। তৃতীয় কারণ,—পুস্তকে তিতুর জীবনী স্থায়ী হইবার সম্ভাবনা।

## অনুরোধ

তিতুমীর যখন ধারাবাহিকরূপে বঙ্গবাসীতে প্রকাশিত হয়, তখন পাঠকগণকে এই অনুরোধ করিয়াছিলাম, তিতুমীর সম্বন্ধে যদি কেহ নূতন তত্ত্ব অবগত থাকেন, তাহা হইলে, তিনি দয়া করিয়া জানাইবেন। সে সম্বন্ধে অনেকে আমাকে যথেষ্ট কৃপা করিয়াছেন। কেহ কেহ, দুই একটি ভ্রমপ্রমাদও দেখাইয়া দিয়াছেন। পুস্তকে সে ভ্রমপ্রমাদ সংশোধিত হইয়াছে। ভ্রমপ্রমাদ দেখাইবার যথেষ্ট অবসর ছিল। অতঃপরও যদি পুস্তকে কোন্ ভ্রমপ্রমাদ থাকে, তাহা হইলে, পাঠক, নিজগুণে দেখাইয়া দিবেন,—ইহাই আমার সানুনয় অনুরোধ। যদি কখন তিতুমীরের ভাগ্যে সংস্করণান্তর সংঘটিত হয়, তাহা হইলে সে সংস্করণে সে ভ্রমপ্রমাদ সংশোধিত হইবে। আমার এই শেষ অনুরোধ,—একবার দয়া করিয়া, "তিতুমীর" আদ্যোপান্ত পাঠ করিবেন, আর আবশ্যক বুঝিলে, অবসর পাইলে, পাত্রাপাত্র-বিবেচনায় "তিতুমীরে"র উদ্দেশ্য-তত্ত্বের আলোচনা করিবেন।

## কৃতজ্ঞতা

নিম্নলিখিত মহাত্মারা "তিতুমীরে"র প্রকাশ-সম্বন্ধে বিবিধপ্রকারে আমায় সাহায্য করিয়াছেন। ইঁহাদের নিকট চিরকৃতজ্ঞ রহিলাম। অমৃতবাজার পত্রিকার কর্ত্তৃপক্ষগণ; শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রনাথ রায় এম এ, বি এল্; শ্রীযুক্ত সত্যচরণ শাস্ত্রী; শ্রীযুক্ত মুন্সী আসগার আলি; শ্রীযুক্ত ত্রৈলোক্যনাথ মুখোপাধ্যায় (টি, এন্, মুখার্জ্জী); বিশ্বকোষ প্রকাশক শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ বসু; হিতৈষী-সম্পাদক শ্রীযুক্ত কালীচরণ মিত্র বি, এ; মুরশিদাবাদ-কাহিনী প্রণেতা শ্রীযুক্ত নিখিলনাথ রায় বি, এ; দৈনিক ও সমাচার-চন্দ্রিকার সহকারী-সম্পাদক শ্রীযুক্ত হরিমোহন মুখোপাধ্যায়; পণ্ডিত শ্রীযুক্ত অতুলকৃষ্ণ গোস্বামী এবং চব্বিশ-পরগণা তারাগুণিয়ানিবাসী 'কল্পনা-মঞ্জরী', প্রভৃতি প্রণেতা শ্রীযুক্ত অঘোরনাথ বসু। ইতি সন ১৩০৪ সাল, তারিখ ১৫ই আশ্বিন।

কলিকাতা,<br>১০নং, রামচাঁদ নন্দীর গলি। } শ্রীবিহারিলাল সরকার

## উপক্রমণিকা

মুসলমান-বিপ্লবটা সহজে কিছু ভয়াবহ হইয়া উঠে। কেননা, এ বিপ্লব-বিভ্রাটের মূল,—ধর্ম্মান্ধতার উৎকট উদ্দীপনা। সকল বিপ্লবে না হউক, অধিকাংশ বিপ্লবে বটে। মুসলমান ধর্ম্মনিষ্ঠ। স্বধর্ম্মে মুসলমানের অসীম অনুরক্তি। ধর্ম্মাচরণে মুসলমানের অপরিমেয় শ্রদ্ধা-ভক্তি। মুসলমান ধর্ম্মের জন্য প্রাণ দিতে পারে; পরন্তু ধর্ম্মের জন্য প্রাণ লইতেও পারে। মুসলমান সহজ-সাহসী ও সদা-বিশ্বাসী। মুসলমান উদ্যমশীল ও শক্তিশালী। মুসলমানের সাহস আছে, বিশ্বাস আছে, তেজ আছে, বিক্রম আছে, উৎসাহ আছে, উদ্যম আছে, ঐকান্তিকতা আছে, একাগ্রতা আছে, একতা আছে, ক্ষমতা আছে; কিন্তু দুর্ভাগ্যবশতঃ অনেক সময় অনেকের হিতাহিত জ্ঞান থাকে না। নিম্নশ্রেণী মুসলমানদের অনেকেই ধর্ম্মের উন্মত্ততায় উদ্‌ভ্রান্ত হইয়া পড়ে। তাই তাহারা অনেক সময় লক্ষ্য ঠিক রাখিতে পারে না। কোথায় কিরূপ ভাবে কিরূপ শক্তি প্রয়োগ করিলে, কিরূপ ভাবে কাজ করিলে, কার্য্যসিদ্ধি হইতে পারে, দেশের ও সমাজের উপকার হইতে পারে, তাহা তাহারা ঠিক করিতে না পারিয়া, অনেক সময় ধর্ম্মের নামে ব্যর্থ শক্তি-প্রয়োগে বিপ্লব সাধন করিয়া, অনর্থক লোকক্ষয় করিয়া বসে। ধর্ম্মের পালন, ধর্ম্মের রক্ষণ, ধর্ম্মের প্রচার, ধর্ম্মের প্রসার, হয়ত তাহাদের চরম সাধু উদ্দেশ্য; কিন্তু কোন্ পথে, কি প্রণালীতে, কি ভাবে, কি প্রকারে, চলিলে বা চালাইলে, সে সাধু উদ্দেশ্য সহজে সিদ্ধ হইতে পারে, তাহা সিদ্ধান্ত করিতে না পারিয়া, নিম্নশ্রেণীর মুসলমানেরা অনেক সময় বিপথে গিয়া পড়ে। বিপথে পড়িয়াই ত তাহারা দেশপ্লাবী মহাবিপ্লবে আত্ম-ধ্বংসের পথ উন্মুক্ত করে এবং পতঙ্গবৃত্তি অবলম্বন করিয়া প্রজ্বলিত হুতাশনে ঝাঁপ দিয়া পুড়িয়া মরে।

পাঠক বোধ হয়, তিতুমীরের নাম শুনিয়া থাকিবেন। ছয়বর্ত্তী বৎসর পূর্ব্বে এই তিতুমীর ভয়ঙ্কর বিদ্রোহানল প্রজ্বলিত করিয়াছিল।

সে বিদ্রোহ-ফলে স্বয়ং তিতুমীরকে বহুসংখ্যক শিষ্য-উপশিষ্যসহ অপঘাতে ইহলোক পরিত্যাগ করিতে হইয়াছিল।

তিতুমীর বহু গুণসম্পন্ন। স্বধর্ম্মে তাহার যেরূপ আসক্তি-অনুরক্তি ছিল, আত্ম ধর্ম্মাচারে তাহার যেরূপ শ্রদ্ধা-ভক্তি ছিল, স্বধর্ম্ম প্রচার-প্রসারে তাহার যেরূপ আন্তরিকতা-ঐকান্তিকতা ছিল, স্বধর্ম্ম-রক্ষাকল্পে তাহার যেরূপ একাগ্রতা-নিষ্ঠামত্তা ছিল, আজকাল মুসলমান-সম্প্রদায়ে তাহা বিরল বলিলেও বোধ হয়, অত্যুক্তি হয় না। তিতুমীর উদ্যোগী সাহসী পুরুষ,—তিতুমীর শক্তিশালী উৎসাহী পুরুষ। সেই তিতুমীরের তাদৃশ শোচনীয় পরিণাম,—ভীষণ-অপমৃত্যু কেন হইল? তিতুমীর আজ কেন ইহজগতে দস্যু-দানব অপেক্ষা হীন-হেয় বলিয়া বিঘোষিত হইতেছে? লোকে কেন আজ তিতুমীরের নাম শ্রবণমাত্র লজ্জা-ঘৃণায় কর্ণে অঙ্গুলি প্রদান করে? লোকে কেন আজ ব্যঙ্গ-বিদ্রূপে তিতুমীরের মস্তকে অজস্র গালি বর্ষণ করে? তিতুমীরের নাম হইলে, তাহার কথা শুনিলে, কেন আজ অনেক মুসলমান পর্য্যন্ত হাস্য-পরিহাস করে? কেন আজ দেশশুদ্ধ লোক তাহাকে এত টিটকারী দেয়? এখনও কেন স্থানে স্থানে পথভিখারীরা উচ্চ-কণ্ঠে,—শ্লেষের সূচিভেদে, তিতুমীরের গান গাহিয়া থাকে? সে গানে কি সাংঘাতিক শ্লেষ আছে, আমাদের অনেক পাঠক বোধ হয় তাহা জানেন না। সেই গানটী এইখানে উদ্ধৃত করিলাম,—

১ নং গান।

উত্তরে এক গ্রাম ছিল নামে নারিকেলবেড়ে,
তাতে হাজার দুই নেড়ে।
ওরে বুড়ো, ওরে বুড়ি, আজকে গাঁয়ের হাট,
কেস্তে দিয়ে দাড়ি কাট॥
তিতুমীর বলে আল্লা, বানাইলাম বাঁশের কেল্লা,
তাতে আমার নাই হেল্লা,
যেমন মাঠ ছিল, তেমনই হ'লো মাঠ,
কেস্তে দিয়ে দাড়ি কাট॥

শুধু শ্লেষ নহে, শুধু ব্যঙ্গ নহে, শুধু বিদ্রূপ নহে, শুধু উপহাস নহে, গানে অবিমৃষ্যকারিতার পরিণাম-স্মৃতির কি অশ্রুময় মর্ম্মান্তিক শোকোচ্ছ্বাস আছে, তাহাও দেখুন ;—

২ নং গান।

নারিকেলবেড়ে গাঁয়েতে একজন ছিল তিতুমীর।
সরা-সরিয়াৎ তিনি করিলেন জাহির॥
পীর-পয়গম্বর, কুতুব-অলি কিছুই তিনি মান্‌তেন্ না,
এবার সার্‌লে ইংরেজের মামু জানে নাক্‌লে না।
সদাই বলে হায় আল্লা, বুঝি প্রাণ যায়, একি হ'লো দায়॥
এবার মাল্লে গুলি, ভাঙ্গলে খুলি, হজরৎ গুলি খেলে না,—
এবার সারলে ইংরেজের মামু জানে নাক্‌লে না॥
সদাই বলে আল্লা-নবি, আমার হ'লো কি,
জোর করে সব ধরে আনলাম গৃহস্থের বৌ ঝি।
তাব প্রতিফল হাতে হাতে জারিজুরি খাটলো না।
এবাব সারলে ইংরেজের মামু জানে নাক্‌লে না।[১]

এখনও অনেক স্থানে নিম্নলিখিত অনুতাপের তাপোচ্ছ্বাসিত গানটী পথভিখারীর মুখে পথে পথে গীত হইয়া থাকে,—

৩ নং গান।

জোলানী উঠিয়া বলে উঠরে জোলা ঝাট।
হাজাম বাড়ী গিয়া শীঘ্র গোঁপদাড়ী কাট॥
তিতুমিরের গলাধরি নসরদ্দি কয়,
তোমার বুদ্ধিতে মামা ঠেকিলাম একি দায়।
এসেছে রাঙ্গা গোরা, উর্দ্দিপরা ব্যাতের টোপ্ মাথায়॥
এরা মারছে গুলি, ভাঙ্গছে খুলি, হজরৎ গুলি মানলে না।
সার্‌লে ইংরেজের মামু, এবার আর জানে রাখলে না॥[২]

---

১ প্রথম ও দ্বিতীয় গান দুটী ২৪ পরগণা-বারাসাতের অন্তর্গত গঙ্গানগর গ্রামনিবাসী কলিকাতার অনাথ বাবুর বাজারের দারোগা শ্রীযুক্ত মুন্সী আসগর আলির নিকট হইতে সংগৃহীত।

২ গানটী বিশ্বকোষ হইতে সংগৃহীত।

তিতুর নামে এত শ্লেষই বা কেন? এত ব্যঙ্গই বা কেন? এত কোপই বা কেন? এত দুঃখই বা কেন? তিতু বহু গুণসম্পন্ন ছিল; কিন্তু বুদ্ধির দোষে তিতু কেবল আত্মহারা হইয়াছিল। আপনার ধর্ম্মমত প্রচার করাই উদ্দেশ্য ছিল; কিন্তু তিতু প্রকৃত পথ চিনিতে পারে নাই। এ নিরাময়, এ শান্তিময়, এ সুখময় এ করুণাময় ইংরেজের রাজত্বে তিতু আপনার ধর্ম্মমত প্রচার করিবার উদ্দেশ্যে অশান্তির পথ অবলম্বন করিয়াছিল। ধর্ম্মের কাজে তিতু প্রকৃত ধর্ম্মপথে যাইতে পারে নাই। ধর্ম্ম-প্রচারে জগতের উপকার করিবার উদ্দেশ্য লইয়া তিতু রাজবিদ্রোহী হইয়াছিল। তিতু জিঘাংসাপরবশ হইয়া প্রতিশোধের প্রকট কামনায় নিরীহ নির্দ্দোষ হিন্দু-মুসলমান প্রজার উপর অত্যাচার করিয়াছিল; টাকা-কড়ি লুঠিয়া লইয়াছিল; ঘর-দ্বার আগুন দিয়া পুড়াইয়াছিল; সতী কুল-লক্ষ্মীর সর্ব্বনাশ করিয়াছিল; হিন্দুর পবিত্র দেবগৃহ কলঙ্কিত করিয়াছিল; রাজশাসন তুড়ি দিয়া উড়াইতে চাহিয়াছিল। এই কি ধর্ম্ম-প্রচারের প্রশস্ত পথ? এই কি সাধনার সিদ্ধিতত্ত্ব? তিতুর যে গুণ ছিল, তিতু সেই গুণে যদি শান্তির সুধাপ্রবাহ পথ দিয়া, আত্মধর্ম্ম প্রচার করিতে পারিত; তিতু যদি সংযম-সাধনায় শত্রুকুলের তাড়না-লাঞ্ছনা উপেক্ষা করিয়া জিঘাংসা-প্রবণতা পরিত্যাগ করিতে পারিত, তাহা হইলে তিতু অনায়াসে সিদ্ধ হইত,—এ জগতে সিদ্ধপুরুষ বলিয়া নাম রাখিয়া যাইতে পারিত। তিতুর অদ্ভুত জীবনী। দেবত্বে পশুত্বে মিশিয়া লোকের কি সর্ব্বনাশ হইতে পারে, তাহা স্থিরচিত্তে দৃঢ়দৃষ্টিতে লক্ষ্য করিয়া দেখিতে পারিলে, লোকের জ্ঞানের উন্মেষণা হয়,—চৈতন্যের উদ্দীপনা হয়। তিতুর জীবন অগ্রাহ্য ভাবিয়া, তাহার বিস্তৃত জীবনী উপেক্ষিত হইয়াছে। সাহিত্যে তিতুর জীবনী অল্পমাত্র স্থান পাইয়াছে। সাধারণে কেবল দুই একটা ছড়ায় তাহার জীবনীর আভাসমাত্র পাইয়া থাকে। একটী ছড়া এইখানে প্রকাশ করিলাম,—

## ছড়া।

### পয়ার।

শুন সব ভক্তি-ভাবে করি নিবেদন।
হজরত আলির লড়ায়ের শুন বিবরণ॥
কৃষ্টদেব রায় হতে, লড়ায়েতে মেতে গেল ন্যাড়া।
ফকিরের বুজরুগীতে লোক হল পুঁড়াছাড়া॥
নাই আর অন্য গতি, ব্রাহ্মণ জাতির থাকা হল ভার।
ব্রহ্মহত্যা গোবধ-আদি কল্লে একাকার॥
কযেকটা জোলা মিলে তাঁত ফেলে মোলবি সব হল।
মুলুকগিরি করি ফিরি, লাউঘাটিতে গেল॥
সেথাতে কল্লে মজা, তুলে ধ্বজা, লড়াই ফতে করে।
রতিকান্ত রায়ের বেটা, দেবনাথকে মারে॥
কইতে ফাটে বুক, বড় দুখ, রায় মরে গেল।
সিংহের মরণ যেন শৃগালের হাতে হল॥
কিন্তু যত ন্যাড়াগণের ঘোড়া কেড়ে গিয়ে লয়।
ঘোড়া জোড়া ফেলে ন্যাড়া পলাইয়ে যায়॥
এই সব আজব কথা, খেলে মাথা, যত ন্যাড়া মেলে।
গেরস্থ লোক পলায় সব, ঘর দুয়ার ফেলে॥
তাদের বা দুখ কত, নারী যত, ঘর ছেড়ে যায়।
দেখলে ন্যাড়া, দেয় তাড়া, বুদ্ধি হত হয়॥
এইরূপ লোটে দেশ, অবশেষ. নারিকেলবেড়ে গিয়ে।
বলে আল্লা, বানায় কেল্লা, বাঁশের ব্যাড়া দিয়ে॥
তিতুমির বাদসা হল, হুকুম দিল, উজিরের তরে।
মৈজদ্দি উজির হয়ে, হুকুম জারি করে॥
যেমত সব ধুলো খ্যালা, ছেলে বেলা, যত ছেলে করে
ফকিরের বুজরুগী, তেমন বুঝহ অন্তরে॥
ফৌজ সব ফেরে কত, দেড়ে যত, ইট লাটী লয়ে।
পোষাকের কথা তাদের, কাজ কিরে ভাই কয়ে॥
শেষেতে একে আর, বাঁচা ভার, শুন সমাচার।
বারঘরের কুটী লুটে কল্লে ছারখার॥

সাহেব যায় পলাইয়ে, খবর নিয়ে, মেজেষ্টারে গিয়ে।
গ্রেপ্তার কারণে সাহেব আইল ফৌজ নিয়ে॥
যত সব চৌকিদার, সমাচার মেজেষ্টারের পেয়ে।
মৌলুবিরদের ঘেরে সব একত্র হইয়ে॥
কিন্তু ঘেরা মাত্র, হাতে অস্ত্র, দাঁড়াইয়ে ছিল।
মার্‌মার্‌ শব্দ করে, মৌলবি সব গেল॥
মাল্লে সেপাই যত, কব কত আহা মরি মরি।
দারগাকে মাল্লে সব চারিদিকে ঘেরি॥
সাহেবের কপাল ভাল, জোর ছিল, দৌড়ে সে পলালো।
সেপাই মেরে, যত দেড়ের বৃদ্ধি বেড়ে গেল॥
মিশাতে পর্ব্বত নাড়ে, ফিরে বাড়ে, বঙ্গে চমৎকার।
নদে জেলার মাজিষ্টার, আইল তারপর॥
কিন্তু তার জাঁক বড়, হয়ে দড়, আদ্ সাহেব এল।
মুলুক বজরা পিনেষ আদি হাতি কতকগুল॥
ধমকে পাষাণ ফাটে, সত্য বটে, মিছে কিন্তু নয়।
একদিন ছাউনি করে বারঘরেতে রয়॥
পরদিন কামান ছোটে, সাহেব ওটে, দেলপুরু হয়ে।
বারাসতের মাজিষ্টার আইল ফৌজ লয়ে॥
এইটে ভেবে মনে, ডেভিসনে নদের সাহেব বলে।
বারাসাতের ফৌজ এসেছে চলহ সকলে॥
দেখিগে নারিকেলবেড়ে, যত দেড়ে, কেত্তা লড়াই ছ্যায়।
বুকে পিঠে মারব গোলা বাঁচবে কে কোথায়॥
ডেভিসন্ ইএশ্ বলিল, সব হইল, হাতির উপর চড়ে।
মার্ মার্ শব্দ করে চল্লো নারিকেলবেড়ে॥
হাতি যায় দশ বারটা, ঘোড়া ছটা, সাত আটজন ইংরাজ।
পিছে পিছে চল্ল সব থানার বরকন্দাজ॥
দারগা সমিভারে, একত্রে যাচ্ছে মহিম দিতে।
হাতীর আগে সুবল গোলক চল্লো লাঠী হাতে॥
বাদামের পাতা শিরে, চিহ্ন করে, দিল সাহেবেতে।
দেখতে পেয়ে এল ধেয়ে যতেক হেদাতে॥

তলোয়ার লাঠী হাতে, বন্দুক সাতে লয়ে কতকগুলা।
সাহেবকে তাড়ায়ে লয়ে চল্লো কাছা খোলা ॥
সুবল গোলকে বলে, গণ্ডগোলে কাজ কি হেথা থেকে।
মাথার পাতা ফেলে, এখন পার হও পাটনি ডেকে ॥
সাহেব লোক বজরায় ওঠে, বিপদ ঘটে, বন্দুক নিল হাতে।
কাট্ কাট্ বলে গেল বজরার নিকটে ॥
এসে সব হল খাড়া, যত ন্যাড়া, লড়াই করিবারে।
বজরা ভাসাস্‌নেরে বলে ইট ফেলে মারে ॥
সাহেবের বাঁচা ভার, বে-একতার কল্লে কাজে কাজে।
গোটা পাঁচ ছয় দেওড় করে, থেকে বজরার মাঝে ॥
গোটা কয়েক জখম হলো, টেনে নিল পিছের হেদাতেরা।
গুলিওয়ালাব কাছে সাহেব জিজ্ঞাসে অস্তরা ॥
ঘ্যাওড়ে পড়ে কি না, যায় না জানা, বজরার ভিতর থেকে।
গুলিওয়ালা বলে সাহেব পড়লো এসে ঝুকে ॥
এদের কেউ মরে নিকো, দন্ত ঘ্যাখ যত পাতি নেড়ে।
জানে বাঁচ যদি, সাহেব পলাও হাতি চোড়ে ॥
সাহেবের হল ভয়, অতিশয়, এ সব দাড়া দেখে।
ফকিরের বুজরুগী আছে, কাজ কি হেথা থেকে ॥
হাতিতে হয়ে সর, মেজিষ্টার নদী পার হল।
চক্ষের নিমিষে সাহেব ঘোলামেদে গেল ॥
হেদাতের হল দেশ, নেড়ের শেষ, এককালে হয়।
কিন্তু চম্‌চমা লাগে ইথে গবরনরের ভয় ॥
কাপটেন সাহেব ডেকে, হুকুম তাকে গবরনর যে দিল।
কেল্লায় যেয়ে ফৌজ সব বেছে বেছে নিল ॥
এল সব ঘোড়ায় চড়া, হয়ে খাড়া, হ্যাঙ্গার পাশে ঝোলে।
কি শোভা করেছে তাদের পোশাকের লালে॥
যেন সব যমদূত, রজপুত আদি কতকগুলি।
সেপাই আইল সব লয়ে বন্দুক-গুলি ॥
ফৌজ সব এল যত, কব কত, বর্ণিতে না পারি।
নারকেলবেড়ে হল জ্যান যম রাজার পুরি ॥

কামানের শব্দ শুনে, ফকির পানে, মৌলুবি সব চায়।
বুজরুগী সব ফাঁকি জান্ গেলোরে হায় ॥
ফকির বলে তখন, বাপুধন, ভয় করবে কারে।
এই ছাখ গোল্লা খাই হজরতের বরে ॥
সেটাত মিথ্যা নয়, সত্য হয়, গোল্লা খেতে হবে।
মৈজদ্দী কেঁদে বলে উজীর কেজ লবে ॥
কাপটেন সাহেব জোরে, ফকিরেরে কহেন এক কথা।
দস্তগির্ হবে কি লড়ায়ে দিবে মাথা ॥
ফকির বলে ভাই, লড়াই চাই, দস্তগির্ না হব।
গোল্লা মার এখন আমি ধরে ধরে খাব ॥

### ত্রিপদী।

বলে ফকির, কোথায় উজীর,
হুকুম জারি করে।
শুনে উজীর, হলো হাজীর,
ফকিরের হুজুরে ॥
হুকুম ছায়, কারে ভয়,
লড়াইতে সাজে।
দিয়ে সায়, উজীর যায়,
হেদাতের মাঝে ॥
করে ধূম, বড জুম,
মৌলুবি সব মাতে।
কেউ ঢাল, তলওয়ার,
পিস্তল লয়ে হাতে ॥
ধায় নেড়ে, কালা পেড়ে,
বলে আয় ধিরে।
হাঁকে হাঁকে, ঝাঁকে ঝাঁকে,
ইট ফেলে মারে ॥
ইঙ্গরেজে, তবে সাজে,
হুকুম দিল কাপ্‌টেনে।

হুকুম পেয়ে, সেপাই ধেয়ে,
যায় কেল্লা পানে ॥
তোপ ছাড়ে, দেড়ে পরে,
মরে ঝাঁকে ঝাঁকে।
ঘোর শবদ, শুনি তবধ,
আল্লা বলে ডাকে ॥
কোন দেড়ে, যায় দৌড়ে,
তরুক্ সওারে কাটে।
কোটা ফাটে, ধূম ওটে,
ব্যোমের গোল্লা ছোটে ॥
কব কত, মমীন্ যত
পলায়ে যায় ঘরে।
হরু কয়, মিথ্যা নয়,
গেলা ছারে খারে ॥[৩]

এই ত ছড়া। কিন্তু ছড়ার আভাসে কি জীবনী শিক্ষার তৃপ্তি-সাধন হয়? তিতুর জীবনী কেবল মুসলমানের নহে; হিন্দু, খৃষ্টান, শিখ, পারসিক, সকল জাতির পাঠ্য। পাঠ্য কেন, শিক্ষণীয় বলিয়া, তিতুর জীবনীতে উদ্‌ভ্রান্তের ভ্রান্তি কাটে,—অশান্তের শান্তি আসে, উন্মাদের প্রলাপ ছুটে,—মূঢ়ের মোহ টুটে।

৩ কলিকাতা বরাহনগর নিবাসী টাঁকীর অন্যতম জমীদার শ্রদ্ধাভাজন সুহৃদ্ শ্রীযুক্ত রায় যতীন্দ্রমোহন চৌধুরী এম্, এ, বি, এল, মহাশয়ের নিকট হইতে এই ছড়ার কিয়দংশ প্রাপ্ত হই। সেই অংশ বঙ্গবাসীতে প্রকাশিত হইয়াছিল। পরে "ছত্রপৎ-শিবজী" ও "প্রতাপাদিত্য" প্রণেতা ভক্তিভাজন সুহৃদ্ শ্রীযুক্ত সত্যচরণ শাস্ত্রী মহাশয় সমগ্র ছড়ার পাণ্ডুলিপি সংগ্রহ করিয়া দেন।

# প্রথম পরিচ্ছেদ

## তিতুর জন্ম

১৭৮২ [illegible] খ্রীষ্টাব্দে জেলা চব্বিশ পরগণার বাদুড়িয়া থানার অন্তর্গত হায়দরপুর গ্রামে তিতুমীরের জন্ম হয়। হায়দরপুর গ্রাম বেঙ্গল সেনট্রাল রেলওয়ের গোবরডাঙ্গা ষ্টেশন হইতে প্রায় চারি ক্রোশ দক্ষিণ-পূর্ব্বে। হায়দরপুর হইতে ইছামতী নদী প্রায় দুই ক্রোশ পথ দূরে অবস্থিত। তিতুমীর মুসলমান। হায়দরপুর গ্রামে অধিকাংশ মুসলমানের বাস।

## তিতুর কাল

তিতুর জন্মগ্রহণ করিবার পঁচিশ বৎসর পূর্ব্বে মাত্র পলাসি-ক্ষেত্রে ব্রিটিস-রাজের বিজয়-পতাকা প্রোথিত হইয়াছিল। তখন মুসলমান-সাম্রাজ্যের গৌরব-স্মৃতি মুসলমানের অন্তস্থলে জাজ্বল্যমান ছিল। সে স্মৃতি-তাপের উষ্ণ ধূমোচ্ছ্বাস তখন মুসলমানের প্রাণে প্রাণে পলকে পলকে উদগত হইতেছিল। তখন বঙ্গদেশ এক প্রকার অরাজকবৎ হইয়া উঠিয়াছিল। ব্রিটিসের প্রভুত্ব তখন বঙ্গে বদ্ধমূল হয় নাই। সুতরাং বঙ্গদেশ তখন একেবারে নিরুপদ্রব হইতে পারে নাই। চোর-ডাকাইতের চরম অত্যাচারে, জমিদারগণের দোর্দ্দণ্ড প্রতাপে, দুর্ব্বলের উপর সবলের আক্রম-বিক্রমে, সকল প্রকার শাসন-শৃঙ্খলার অসদ্ভাবে, সমগ্র বঙ্গভূমি উচ্ছৃঙ্খল হইয়া পড়িয়াছিল।

## তিতুর বংশমর্য্যাদা

হায়দরপুর চব্বিশ পরগণার একটী গণ্ডগ্রাম। সাধারণ গ্রামবাসী মুসলমান অপেক্ষা তিতুমীরের সাংসারিক সম্বন্ধ উচ্চতর। মুন্সী আমীর একজন সম্ভ্রান্ত ধনী জমিদার ছিলেন। বৈবাহিক সম্বন্ধে মুন্সী আমীরের সহিত তিতুর আত্মীয় সম্বন্ধ সংঘটিত হয়। তিতুর বংশমর্য্যাদা বড় ছিল।

## তিতুর মূর্ত্তি

তিতু সুন্দর সুপুরুষ ছিল। তপ্ত কাঞ্চননিভ গৌরাভ;—বলসার গিরিগজবৎ খর্ব্ব দেহ—বলিষ্ঠ ও সুসম্বদ্ধ;—বদনমণ্ডল প্রীতি-প্রফুল্লতাময়,—বিধূম বহ্নিবৎ নয়নযুগল নিত্য তীব্রোজ্জ্বল। তিতুকে দেখিলে মনে হইত,—তিতুর দেহ ধর্ম্ম-সাধনার জন্য নহে,—সমর-লীলার জন্য গঠিত হইয়াছে। সে দেহ ধর্ম্ম-ভাব দ্যোতক নহে,—বীরত্ব-বীর্য্য-ব্যঞ্জক।

## তিতুর বাল্যাবস্থা

যে তিতু উৎকট ধর্ম্মমদোৎকটতায় সুপথ চিনিতে না পারিয়া, উন্মত্ত এবং উদ্‌ভ্রান্ত হইয়াছিল, সেই তিতু বাল্যকালে স্বধর্ম্মে শ্রদ্ধাবান্ ছিল। আপনার ধর্ম্ম-নিষ্ঠায় তাহার প্রগাঢ় আসক্তি ও অনুরক্তি ছিল। আপনার ধর্ম্মে তাহার যেরূপ আসক্তি ছিল, আপনার সম্প্রদায়ের উপরও তাহার সেইরূপ শ্রদ্ধাভক্তি ছিল। মুসলমান শক্তির উচ্ছেদ চিন্তায় বালক তিতুর প্রাণ নিত্য ম্রিয়মান হইত। তিপু সুলতানের শোচনীয় পরাভব ও দিল্লীশ্বর সাহ আলমের অবস্থা-বিপর্য্যয়ের কথা স্মরণ হইলে, তিতু প্রাণে ব্যথা পাইত। আত্মেতর মুসলমানেরা তিতুর প্রাণাপেক্ষা প্রিয় ছিল। সে মনে করিত, যে কোন মুসলমান, তাহার ভ্রাতা, পিতা, মাতা, কিম্বা অন্য কোন আত্মীয় অপেক্ষাও আত্মীয়। স্বধর্ম্মে যাহার এত অনুরাগ, স্বসম্প্রদায়ে যাহার এত মমতা, আত্মধর্ম্মশাসনে যাহার এত শ্রদ্ধা, তাহার হৃদয়ে যে স্বধর্ম্মাবলম্বী, সর্ব্বোচ্চ শক্তিশালী দিল্লীশ্বরের অধঃপতন শেলসম বাজিবে, তাহার আর বিচিত্র কি? তিপুর পরাভবে এবং সাহ আলমের ভাগ্য-বিপর্য্যয়ে মুসলমানের গৌরবভানু জন্মের মতন অস্তমিত হইল, বালক হইলেও, তিতু বোধ হয়, আপনার স্বধর্ম্মানুরাগের দীপ্তরাগপ্রভায় তাহা হৃদয়ঙ্গম করিয়াছিল। সেই নিত্য-প্রবুদ্ধ ধর্ম্মানুরাগের উন্মেষণায় বুঝি তিতুর বালক-হৃদয়ে মুসলমান-গৌরব-উদ্ধারের অসাধ্য-কল্পনা জ্বলিয়া উঠিত! তিতুর বাল্য-যৌবনের কার্য্য-তাৎপর্য্যে এইরূপ সিদ্ধান্ত করিতে হয়।

## তিতুর যৌবনাবস্থা

মুসলমানের গৌরব উদ্ধার হয়ত তিতুর আজন্ম আকাঙ্ক্ষা। তিতুর উদ্দেশ্য ভাল; তিতুর স্বজাতিপ্রীতিও প্রশংসার্হ; কিন্তু তিতু উদ্দেশ্য সিদ্ধির যে পথ অবলম্বন করিয়াছিল, তাহা সর্ব্বথা নিন্দনীয়। ভ্রান্ত তিতু মনে করিয়াছিল, পাশব-বিক্রমে আপন দেশের উদ্ধার হইবে, আপন ধর্ম্মের উদ্ধার হইবে, আপন জাতির উদ্ধার হইবে, আপন সমাজের উদ্ধার হইবে। তিতু একান্ত দৃঢ়প্রতিজ্ঞ পুরুষ; তাই উদ্দেশ্যসিদ্ধির যে পথকে প্রকৃষ্ট ভাবিয়াছিল, সেই পথের পথিক হইবার জন্য যৌবনকাল হইতে আপনার দেহমনকে প্রস্তুত করিয়াছিল।

যৌবনে তিতু সংসারী ছিল। তিতু স্ত্রীপুত্র পরিবার লইয়া সংসার প্রতিপালন করিত। ১৮১৫ খ্রীষ্টাব্দে তিতু কলিকাতায় পেশাদারী পালোয়ান হইয়াছিল। পালোয়ানী পাশব-বিক্রম প্রকাশের একতম পথ নহে কি? কেবল পালোয়ানীতে তিতু তৃপ্ত হইল না। পালোয়ানীতে ত অস্ত্রের সম্পর্ক নাই। পালোয়ানের প্যাঁচে ত অস্ত্র-শিক্ষা নাই। অস্ত্র শিক্ষা না হইলে, অস্ত্র-ব্যবহার করিতে না পারিলে, অস্ত্র-সঞ্চালনের কৌশল আয়ত্ত না হইলে, অস্ত্রের লক্ষ্য-নির্দ্ধারণের শক্তি না জন্মিলে, পাশব-বিক্রমে উদ্দেশ্যসিদ্ধির আশা বৃথা। তাই বুঝি, তিতু পালোয়ানী ছাড়িয়া, নদীয়ায় কতকগুলি জমিদারের নিকট লাঠিয়ালের চাকরী গ্রহণ করিয়াছিল। পাশব-বিক্রম-সঞ্চয়ের ফল হাতে হাতে ফলিল। তিতু জমিদারদিগের চাকুরী করিবার সময় একটা বিষম দাঙ্গা-হাঙ্গামায় লিপ্ত হইয়াছিল। সেই অপরাধে তাহার কারাদণ্ড হয়।

## তিতুর ধর্ম্মতত্ত্ব

কারাবাস হইতে মুক্তিলাভ করিয়া আসিলে পর, এক সময় দিল্লীর রাজপরিবারের কোন এক ব্যক্তির সহিত তিতুমীরের আলাপ পরিচয় হয়। এই আলাপ-পরিচয় তিতুমীরের মতান্তর অবলম্বনের অন্যতম একটা হেতু হইল। যাঁহার সহিত আলাপ-পরিচয়

হইয়াছিল, তিতু তাঁহার সহিত মক্কায় গিয়াছিল। তখন তিতুর বয়স ৩৯ বৎসর। মক্কা-তীর্থে সৈয়দ আহম্মদের সহিত তিতুর আলাপ হইল। সৈয়দ আহম্মদ মুসলমান ওয়াহাবী-সম্প্রদায়ের অন্যতম প্রচারক। পরন্তু সৈয়দ আহম্মদ ওয়াহাবী সম্প্রদায়ের মত-সংস্কারক। তিনি অনেকগুলি নূতন মতের প্রবর্ত্তন করেন। এখন অনেক মুসলমানের নিকট সৈয়দ আহম্মদ "ইমাম" বলিয়া সম্মানিত ও পূজিত হইয়া থাকেন। মক্কায় তিতু এই সৈয়দ আহম্মদের শিষ্যত্ব গ্রহণ করিয়াছিল। এতদিন তিতু যে উদ্দেশ্য হৃদয়ে পোষণ করিয়া আসিতেছিল, সৈয়দ আহম্মদের শিষ্যত্ব তাহারই সহায়-পোষক হইল। ধর্ম্মের জন্য যুদ্ধে প্রাণ দেওয়া ধর্ম্ম, সৈয়দ আহম্মদের ইহাই প্রধানতম মত। মুসলমান ধর্ম্মের জন্য যুদ্ধ করিয়া যদি মুসলমান জাতির উদ্ধার সাধন হয়, তাহা হইলে, মুসলমানদের উদ্ধার হইল।

তিতু যে গুরুর শিষ্য হইয়াছিল, সেই গুরু তিতুকে শিখাইয়াছিলেন, যতদিন প্রাণ থাকিবে, ততদিন ধর্ম্মের জন্য যুদ্ধ করিবে। তিতু যে মন্ত্র পাইয়াছিল, তাহাতে তিতু বুঝিয়াছিল, ধর্ম্মের জন্য প্রাণান্তপণে যুদ্ধ করিতে হইবে। তিতু এই গুরুর আদেশ শিরোধার্য্য করিয়া, এই মন্ত্র হৃদয়ে পোষণ করিয়া, বাঙ্গালায় ফিরিয়া আসিয়াছিল। তিতু বাল্যে যাহা চাহিয়াছিল, যৌবনে যাহার পোষণ করিয়াছিল; প্রৌঢ়ে তাহাই পাইল।

### তিতুর ওয়াহাবীত্ব

এইখানে ওয়াহাবী তত্ত্বের একটু তাৎপর্য্য প্রকাশ করা প্রয়োজনীয়; নহিলে তিতুর মতটা ভাল বুঝা যাইবে না। সাধারণতঃ মুসলমানের "সুন্নি ও সিয়া" নামে দুই সম্প্রদায় আছে। বাহ্যগঠনে, বাহ্য-অনুষ্ঠানে, ধর্ম্মসংক্রান্ত বাহ্যোৎসবে এবং পবিত্রতার বাহ্য-ভাব-প্রণোদনে "সিয়া"-সম্প্রদায়ের পরম-প্রীতি। "সুন্নি" সম্প্রদায়ের ইহার বিপরীত ভাব। তাহাদের মত,—বাহ্যানুষ্ঠান প্রকৃত মুসলমান ধর্ম্মসম্মত নহে। পবিত্র স্থান পরিদর্শনে সুফল

হয়, সাধু ব্যক্তির সাধন-পূজায় লাভ আছে, "সিয়া"-সম্প্রদায়ের এই বিশ্বাস। সুন্নি-সম্প্রদায়ের কিন্তু এ বিশ্বাস নাই। এই দুই সম্প্রদায়ের আবার অনেক ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দল আছে। সে সকল দলের কার্য্যানুষ্ঠানের অল্পবিস্তর তারতম্য আছে। মতবিরোধ হেতু সিয়া ও সুন্নি-সম্প্রদায়ে চিরবিরোধ পরিলক্ষিত হইয়া থাকে। ওয়াহাবী, সুন্নি-সম্প্রদায়ের একটি শাখা। "ওয়াহাবী" কথাটি মূলত আরব দেশের এক সম্প্রদায়ে প্রযোজ্য। এই সম্প্রদায়ের প্রবর্ত্তক সেখ আবদুল ওয়াহাবের নাম হইতে "ওয়াহাবী" নামের সৃষ্টি হইয়াছে। গত শতাব্দীর প্রারম্ভে মধ্য-আরবের নাজদ প্রদেশে আবদুল ওয়াহাবের জন্ম হয়। তিনি এই মত প্রচার করেন, "এক ঈশ্বরকেই বিশ্বাস করিবে। কেবল তাঁহাতেই নির্ভর করিবে। যাহাতে ঈশ্বরের অপগমতা হয়, সেরূপ ভাবে মহম্মদকে বাড়াইবে না। কোনরূপ মূর্ত্তি, উৎসব বা উপবাসাদি অনুষ্ঠানে যেন মতি-গতি না থাকে। তরবারির সাহায্যে মুসলমান-ধর্ম্মের প্রসার বৃদ্ধি করিতে হইবে।"

বর্ত্তমান শতাব্দীর প্রারম্ভে ভারতে ওয়াহাবী মত প্রবর্ত্তিত হয়। এই সময়ে ফরিদপুরের কাজি সরিয়াতুল্লা বঙ্গদেশে এই মতের প্রবর্ত্তন করেন। ইহার শিষ্য-উপশিষ্যবর্গ ফেরাজি বলিয়া অভিহিত হইয়া থাকে। নানা কারণে ইহারা ভারতে প্রবল হইতে পারে নাই। কিন্তু সরিয়াতুল্লা যে মত প্রচার করিয়াছিলেন, তাহার ফলে বঙ্গের মুসলমানেরা সৈয়দ আহম্মদের মত শীঘ্র সাগ্রহে গ্রহণ করিতে সক্ষম হইয়াছিল। অযোধ্যার রায়বেরিলিতে সৈয়দ আহম্মদ জন্মগ্রহণ করেন। ইনি অল্প বয়সে গৃহ পরিত্যাগ করিয়া, টঙ্কের নবাব আমীর খাঁ পিণ্ডারীর একটী সৈনিক-পদে নিযুক্ত হন। ১৮১৭ খ্রীষ্টাব্দে তিনি টঙ্ক পরিত্যাগ করিয়া দিল্লী গিয়াছিলেন। তথায় তিনি বিখ্যাত সাহা আবদুল আজিজের শিষ্যত্ব গ্রহণ করেন। সাহা আবদুল আজিজ ভারতের একজন বিখ্যাত মুসলমান পণ্ডিত ছিলেন। ভারত ছাড়াইয়া তাঁহার সুনাম প্রচারিত হইয়াছিল।

মুসলমান সম্প্রদায়ের উপর তাঁহার সম্পূর্ণ আধিপত্য হইয়াছিল।

সৈয়দ আহম্মদ ১৮২০ খ্রীষ্টাব্দে পঞ্জাবের শিখদের বিরুদ্ধে ধর্ম্ম-যুদ্ধ ঘোষণা করিয়াছিলেন। ১৮২১ খ্রীষ্টাব্দে তিনি কলিকাতায় আসিয়াছিলেন। পরে ১৮২২ খ্রীষ্টাব্দে মক্কায় যান। তথা হইতে ১৮২৩ খ্রীষ্টাব্দে তিনি আবার কলিকাতায় আসেন। শিখদের সহিত যুদ্ধে তিনি পরাজিত হন। ১৮৩১ খ্রীষ্টাব্দের মে মাসে কালাকোটে শিখদের সহিত যুদ্ধে সৈয়দ আহম্মদ নিহত হন।

পাবনার মহম্মদ হোসেন সৈয়দ আহম্মদ কর্ত্তৃক খালিপা-পদে নিযুক্ত হন। সৈয়দ আহম্মদ মহম্মদ হোসেনকে যে সনন্দ দেন, তাহাতে সৈয়দের মতের আভাস পাওয়া যায়। সেই আভাসটুকু এই,—

(১) ভগবানের বিভূতি যেন মানুষে আরোপিত না হয়।

(২) কোনরূপ বাহ্যানুষ্ঠান বা বাহ্যোৎসব করিবে না।

প্রথম মতের ব্যাখ্যা এই,—পরী, প্রেত, ভূত, পুরোহিত, শিষ্য, ছাত্র, পীর-পয়গম্বর কাহারও ভাল করিবার শক্তি নাই,—মন্দ করিবারও ক্ষমতা নাই। পীর-পয়গম্বর, পরী, প্রেত, কাহারেও পূজা করিবে না।

দ্বিতীয় মতের ব্যাখ্যা এই,—বিবাহে বা মৃত্যুতে কোনরূপ উৎসব-অনুষ্ঠান করিবে না। সমাধি সজ্জিত করা, সমাধির উপর ঘর-বাড়ী তৈয়ারি করা, তাজিয়া তৈয়ারি করা, মৃতের বাৎসরিক উৎসব করা, ইত্যাদি নিষিদ্ধ। কথায় না হয়, তরবারিতে লোকের মতি-গতি ফিরাইবে।

এইরূপ মত লইয়া সৈয়দ আহম্মদের শিষ্য তিতুমীর দেশে ফিরিয়া আসিয়াছিল। এই মতের অনুসরণ করিতে গিয়া, তিতুমীর আগুন জ্বালাইয়া দিয়াছিল। এই মতের প্রভাবেই তিতুর পাশব-বিক্রম প্রকাশের পথ প্রশস্ততর হইল।[8]

৪ *"A sketch of the Wahibhis in India down to the death of Seyyed Ahmad in 1831."* Calcutta Review, Vol. 50 pp 73—104.

## দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

### তিতুর ধর্ম্মপ্রচার

১৮২৯ খ্রীষ্টাব্দে তিতুমীর মক্কা হইতে ফিরিয়া আসে। মক্কায় হজ করিবার পর তিতুর নাম তিতু মিঞা হইল। হায়দরপুরে তিতু মিঞা আপনার ধর্ম্মমত প্রচার করিতে আরম্ভ করে। তখন বাঙ্গালার অনেক মুসলমানের আচার-ব্যবহার অনেকটা হিন্দুর ন্যায় ছিল। জোলা, নিকারী, পটুয়া, বাদ্যকর প্রভৃতি মুসলমান সম্প্রদায় হিন্দু-আচারী। তাহারা হিন্দুর ন্যায় চলিবে, ইহা তিতুমীর সহিতে পারিল না। তিতু উদ্যোগী শক্তিশালী পুরুষ। কেবল হিন্দু মতে নহে, যে সকল মুসলমান তিতুর মতাবলম্বী ছিল না, তিতু তাহাদিগকে আপনার মতাবলম্বী করিবার জন্য প্রাণান্তপণ করিল। নিজ গ্রামে এবং নিকটবর্ত্তী গ্রামে নব-সংস্কৃত ওয়াহাবী ধর্ম্ম প্রচারিত হইতে লাগিল। তিতুর ধর্ম্মমতে অনেক মুসলমানও প্রীত নহে। তিতুর মতে পীর-পয়গম্বর মানিতে নাই,—মন্দির-মস্‌জিদ তৈয়ারি করিতে নাই,—শ্রাদ্ধ শান্তির ( মুসলমানী কথা,—'ফয়তা' ) প্রয়োজন নাই,—টাকা কর্জ্জ দিয়া সুদ লইতে নাই। তিতু প্রচার করিল,—পর্ব্বোপলক্ষে বা পুত্র-কন্যার বিবাহে বাদ্যোদ্যম করিবে না,—কাছা দিয়া কাপড় পরিবে না। অন্যান্য ধর্ম্মমতাবলম্বী সম্ভ্রান্ত মুসলমানেরা তিতুর ধর্ম্মপ্রচারে ক্রুদ্ধ হইয়া উঠিলেন। তবে নিম্ন-শ্রেণীর মুসলমানেরা তিতুর বাক্‌পটুতায় বিমোহিত হইয়া তিতুর দলভুক্ত হইতে লাগিল। অল্পদিনের মধ্যে প্রায় তিন চারি শত লোক তিতুর শিষ্যত্ব স্বীকার করিল। যাহারা তিতুর শিষ্যত্ব গ্রহণ করিত, তাহাদিগকে দাড়ি রাখিতে হইত। এই দাড়ির একটা মাপ নির্দ্ধারিত হইয়াছিল। দাড়ি, কাছা-খোলা এবং মাথার মধ্যভাগ কামান, তিতুর মতের বিশিষ্ট বাহ্য স্বাতন্ত্র্য-নিশানা। শিষ্যগণের

প্রতি কঠোর আদেশ হইল, যাহারা স্বদলভুক্ত নহে, তাহাদিগের সঙ্গে যেন কোনরূপ সমাজ-সংস্রব না থাকে। ক্রমে তিতুর শক্তি বাড়িতে লাগিল। নারকেলবেড়িয়ার চতুষ্পার্শ্বে দশ পনের ক্রোশ ব্যাপী ভূভাগে তিতুর শক্তি প্রসারিত হইল।

যাহারা তিতুর শিষ্যত্ব গ্রহণ করিয়াছিল, তাহারা রাত্রিতে তিতুর বাড়ীতে সমবেত হইত। এই সময় একজন ফকির আসিয়া তিতুমীরের সহায় হইয়াছিল। ফকির নানাপ্রকার ঐন্দ্রজালিক ব্যাপারে অশিক্ষিত লোকদিগকে যেন মন্ত্রমুগ্ধ করিয়া ফেলিয়াছিল। তাহার ঐন্দ্রজালিক প্রভাবে এবং তিতুর প্রচার-গুণে দলে দলে লোক আসিয়া ফকির এবং তিতুর পদানত হইল। যখন শিষ্য দিগের ভক্তি চরমে উঠিয়াছিল, তখন তাহারা আহার-নিদ্রা ও বিষয়-কর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়া, অহোরাত্র তিতুমীর ও ফকিরের সেবায় নিযুক্ত থাকিত। জোলারা বস্ত্র-বয়ন প্রভৃতি কার্য্যে মনোযোগ করিত না এবং পরিবারাদির কোন তত্ত্ব রাখিত না; কেবল তিতুমীর ও ফকিরের নিকটে থাকিত। ভক্তির ইহাই ত স্বতঃসিদ্ধ ধর্ম্ম। তিতু অবশ্য ভাবিত, সে যাহা করিতেছে, যাহা বলিতেছে, তাহাই সত্য। ভক্ত শিষ্যেরাও বুঝিত, তাহাই সত্য। সত্যের প্রচার হউক, ইহাই গুরু-শিষ্যের চরম উদ্দেশ্য।

## তিতুর নিন্দা

তিতুর মত সত্য কি নিত্য, মিথ্যা কি অমূলক, তাহার বিচার করিবার এ স্থান নহে। তবে তিতু যাহা সত্য ভাবিয়াছিল, তাহার প্রচার সে অবশ্যকর্ত্তব্য মনে করিয়াছিল। প্রচার হউক; কিন্তু প্রচারের পথ ও প্রণালী পাপান্বিত। তিতু বহু গুণ-সম্পন্ন ছিল; কিন্তু তিতু পরধর্ম্ম সহিতে পারিত না। সেই পরধর্ম্ম অসহিষ্ণুতা তাহার পাশব-বিক্রমের উত্তেজিকা হইয়াছিল। তাই তিতুর প্রচার-উদ্দেশ্য সফল হয় নাই। এই পরধর্ম্মের অসহিষ্ণুতাফলে তিতুর গুরু সৈয়দ আহম্মদ পূর্ণ মনোরথ হইতে পারেন নাই। আহম্মদের শিষ্যগণ গোপনে গোপনে ধীরে ধীরে পূর্ব্বমত পরিত্যাগ করিয়া

নূতন মতে কাজ করিয়াছিল ; কিন্তু পরধর্ম্মের অসহিষ্ণুতাটুকু চাপিয়া রাখিতে পারে নাই। পরের ধর্ম্ম সহিতে পারিত না বলিয়া আহম্মদের শিষ্যমণ্ডলী পরধর্ম্মাবলম্বীকে আক্রমণ করিয়াছিল। একজন পঞ্জাবী মালিক মহরমের সময় মুসলমানের মসজিদ ভাঙ্গিয়া দিয়াছিল। তাই তাহার জমিদার তাহার অর্থদণ্ড করিয়া তাহাকে বন্দী করিয়াছিলেন। ১৮৩১ খ্রীষ্টাব্দে পূর্ব্ববঙ্গ উত্যক্ত হইয়া উঠিয়াছিল। ঐ বৎসর এপ্রিল মাসে আহম্মদশিষ্য ফরিদপুরের সরিয়ৎউল্লা একটী গ্রাম আক্রমণ করিয়া গ্রামটী লুঠিয়া লইয়াছিল। গ্রামের একজন লোক তাহার মতাবলম্বন করে নাই বলিয়া, সমগ্র গ্রাম লুণ্ঠিত হইয়াছিল। পরের ধর্ম্ম সহিতে না পারিয়া, পরের ধর্ম্মকে ঘৃণা করিয়া, পরধর্ম্মীকে আক্রমণ করিলে, বিরোধ ঘটে। সেই বিরোধইত সর্ব্বনাশের মূল।

তিতু পরধর্ম্মাবলম্বী,—এমন কি পরমতাবলম্বী মুসলমানকে ঘৃণা করিত। এ ঘৃণার ফলে তিতুর পাশব-বিক্রমের প্রয়োজন হয়। তিতু গ্রাম লুঠিয়াছিল ; এমন কি, মুসলমানের মস্‌জিদ পুড়াইয়া দিয়াছিল। এ উৎপাতের অবশ্য উত্তেজনা হেতু হইয়াছিল। তিতুর আচরণে অন্য মতাবলম্বী মুসলমানেরা উৎকণ্ঠিত হইল। তাহারা পুঁড়া-গ্রামের জমিদার কৃষ্ণদেব রায়ের নিকট তিতুর আচরণের কথা জানাইল। যে সকল জোলা তিতুমীরের মতানুসারে চলিতেছিল, তাহাদের আত্মীয়েরাও উক্ত জমিদার রায় মহাশয়ের শরণাপন্ন হইল। রায় মহাশয় তাহাদিগকে সান্ত্বনা করিয়া বাড়ী পাঠাইয়া দেন।

### তিতুর দাঙ্গা

এই সময় ৺কৃষ্ণদেব রায় প্রবল প্রতাপান্বিত জমিদার ছিলেন। সাধারণতঃ বাঙ্গালার অধিকাংশ জমিদার তখনও শক্তিশূন্য হন নাই। তবে নবাব আলিবর্দ্দী খাঁর সময় যে সম্মান-গৌরবে, যে বীরত্ব-বিভবে, যে শক্তি-সামর্থ্যে, যে জ্ঞান-বিক্রমে বাঙ্গালার জমিদারবর্গ যশস্বী হইয়াছিলেন, তিতুমীরের সময় জমিদারবর্গের

সে সম্মান-গৌরব, সে বীরত্ব-বিভব, সে শক্তি-সামর্থ্য, সে জ্ঞান-বিক্রম ছিল না। আলিবর্দ্দীর সময় জানকীরাম আলিবর্দ্দীর প্রধান মন্ত্রী ছিলেন; রায়দুর্লভ উড়িষ্যার শাসনকর্ত্তা হইয়াছিলেন; রায়-গড়ের জমিদার মুসলমান সৈন্যগণের সহিত অসীম বিক্রমে যুদ্ধ করিয়াছিলেন; জমিদার পালোয়ান সিংহ মুসলমান-সৈন্যের অধ্যক্ষ হইয়াছিলেন; জগৎ শেট দ্বিতীয় ধনকুবের ছিলেন। তিতুমীরের সময় জমিদারবর্গ এরূপ যশোভাক্ না হউন; কিন্তু তখনও প্রজারা জমিদারগণকে ভয় করিত; জমিদারগণ অবাধ্য অশান্ত প্রজাগণের শাসন করিতেন; বাঙ্গালায় ইংরেজ-রাজত্ব তখন প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল বটে; শাসনেরও অপেক্ষাকৃত শৃঙ্খলা-ব্যবস্থাও হইয়াছিল বটে; কিন্তু জমিদারবর্গ তখনও একেবারে হৃতশক্তি হন নাই; তখনও প্রজা-জমিদারের স্বত্বাস্বত্ব নির্ণয় করিবার আইন-কানুনের সৃষ্টি হয় নাই; তখনও জমিদারের নামে কোনরূপ অভিযোগ-কল্পনার কথা প্রকাশ হইলে প্রজার রক্তশোষণ সুদূর-পরাহত হইত না; তখনও কোনরূপ অত্যাচার করিয়া, প্রজার কোন প্রকারে পার পাইবার সম্ভাবনা থাকিত না। সুতরাং প্রবল প্রতাপান্বিত জমিদার কৃষ্ণদেব তিতুমীরের বিরুদ্ধে আপনার প্রজামণ্ডলীর অনুযোগ শুনিয়া, তিতুমীরের মতাবলম্বী প্রজাদিগকে শাসন করিবার চেষ্টা না করিয়া, নিশ্চিন্ত থাকিতে পারেন কি?

কৃষ্ণদেব হুকুম দিলেন, তাঁহার জমিদারী মধ্যে যাহারা ওয়াহাবী মতাবলম্বী, তাহাদিগের প্রত্যেককে দাড়ির উপর আড়াই টাকা করিয়া খাজনা দিতে হইবে। হিতে বিপরীত হইল। কৃষ্ণদেব পুঁড়া গ্রামে নির্ব্বিঘ্নে দাড়ির খাজনা আদায় করিয়াছিলেন। পরে তিনি সর্পরাজপুর গ্রামে খাজনা আদায় করিতে অগ্রসর হন। তিতুমীর এই খাজনার কথা শুনিয়া ক্রোধে জ্বলিয়া উঠিয়াছিল। সর্পরাজপুর গ্রামে যে খাজনা আদায় করিবার চেষ্টা হইবে, তিতুমীরের দলভুক্ত লোকেরা পূর্ব্বে তাহার সন্ধান পাইয়াছিল। তাই তাহারা পূর্ব্ব হইতে সর্পরাজপুরে দল বাঁধিয়া একত্র হইয়াছিল।

সর্পরাজপুরের লোকেরা হায়দারপুর গ্রামে গিয়া জমিদারের কথা জানাইল। জমিদার দাড়ি প্রতি জরিমানা আদায় করিবেন শুনিয়া তিতু ক্রোধ কম্পিত কলেবরে বলিয়া উঠিল,—"আমাদের ধর্ম্মের কথায় কথা কহিবার কাফেরের কোন এক্তিয়ার নাই। কৃষ্ণদেব শয়তানি করিতেছে। তোমরা জরিমানা দিও না। জমিদার ডাকিলেও তাহার কাছারিতে যাইবে না। তারপর যাহা করিতে হয়, আমি করিব।"

তিতুর কথা শুনিয়া সকলেই আশ্বস্ত হইল বটে, কিন্তু জমিদারের প্রবল প্রতাপের বিভীষিকা যাহাদের মনে আবির্ভূত হইল, তাহারা তিতুর তেজস্বী নির্ভীক আশ্বাস-বাক্যেও ইতস্তত করিতে লাগিল। তিতু আবার এমনই অগ্নিবর্ষী জ্বলন্ত উৎসাহ-বাক্যে সাহস দিল যে, বিষম বিপদ্‌ত্রাণে তিতুর শক্তি সম্বন্ধে কাহারও সন্দেহ রহিল না।

ইতিপূর্ব্বে জমিদার সর্পরাজপুরবাসী তিতুর মতাবলম্বী মুসলমান-দিগকে কাছারী ডাকাইয়া লইয়া জরিমানা দিবার হুকুম করিয়া-ছিলেন। মুসলমানেরা জরিমানা দিব বলিয়া দশ দিনের সময় লইয়াছিল।

দশ দিন কাটিয়া গেল। তিতুর কথায় কেহ আর জরিমানা দিতে জমিদারের কাছারিতে যায় নাই। জমিদার কৃষ্ণদেব তিতু-শিষ্য মুসলমান-প্রজাদিগকে ডাকিয়া আনিবার জন্য একজন বরকন্দাজসহ ভাঁড়ারী মুচিরামকে পাঠাইয়া দেন। মুচিরাম সর্প-রাজপুরে উপস্থিত হইয়া দেখে, তিতু শিষ্যসহ নমাজগৃহে নমাজ পড়িতেছে। মুচিরাম জমিদারের হুকুম জানাইল। তিতু বিকট হাস্যে যেন তীব্র বিদ্যুদুচ্ছ্বাস উদ্গার করিয়া মুচিরামকে ধরিবার জন্য হুকুম দিল। হুকুম শুনিয়া মুচিরাম পলায়ন করে। বরকন্দাজ পলাইতে না পারিয়া তিতুশিষ্য কর্ত্তৃক নির্জ্জিত ও লাঞ্ছিত হইল। এদিকে মুচিরাম ফিরিয়া গিয়া, কৃষ্ণদেবকে সকল সমাচার অবগত করিল। কৃষ্ণদেব তখনই তিতুকে ধরিয়া আনিবার জন্য চারজন বরকন্দাজ পাঠাইয়া দেন। বরকন্দাজেরা লাঠি লইয়া ছুটিল; কিন্তু

গিয়া যাহা দেখিল, তাহাতেই অবাক্! তাহারা দেখিল, তিতুর বহু বলবান শিষ্য সকলেই সলগুড় সুসজ্জিত। একটু অগ্রসর হইলে, কাহাকেও প্রাণ লইয়া ফিরিতে হইবে না। অবস্থা বুঝিয়া, তাহারা প্রাণ রক্ষার ব্যবস্থা করিল; অর্থাৎ নিঃশব্দে নীরবে প্রভুর আজ্ঞা প্রভুর জন্য রাখিয়া সকলে পলায়ন করিল।

কৃষ্ণদেব কৃতজ্ঞ কিঙ্করকুলের কর্ত্তব্য-পরায়ণতার পরিচয় পাইয়া আপন অদৃষ্টকে শতবার ধিক্কার দিলেন। আর করিবেন কি? তিতুর বিক্রমচর্চ্চায় তিনি সিদ্ধান্ত করিলেন, দুটো হুমকীতে তিতু ভয় পাইবার লোক নহে; ভাল এখন থাক্, সময় বুঝিয়া ব্যবস্থা করিতে হইবে। অতঃপর তিতুকে শাসন করিবার জন্য তিনি প্রস্তুত হইতে লাগিলেন। তিতুকে শাসন করিবার যোগ্য লোকবল সংগৃহীত হইলে পর, একদিন কৃষ্ণদেব প্রায় তিন চারিশত লোকবল-সহ সর্পরাজপুরে প্রবেশ করেন। একটা দারুণ দাঙ্গা বাঁধিয়া গেল। অনেকগুলি বাড়ী লুণ্ঠিত হইল। তিতুর নমাজঘর ভস্মীভূত হইয়া গেল। কিন্তু জয়-পরাজয়ের কোন সিদ্ধান্ত হইল না। বাদুড়িয়া থানায় পুলিশকে উভয় পক্ষ সংবাদ দিল। জমিদারের লোকেরা অভিযোগ করিল,—"তিতুর দল আমাদের লোকদের গ্রেপ্তার করিয়া কয়েদ করিয়াছে।" তিতুমীরের লোকেরা বলিল,—"জমিদারের লোকেরা লুটপাট করিয়াছে।" থানার মুহুরী তদারক করিবার জন্যে অকুস্থলে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। জমিদার কৃষ্ণদেব পলায়ন করিয়াছিলেন। কিছুদিন লুকাইয়া থাকিয়া তিনি ৭ই জুলাই তারিখে বারাসতের জয়েণ্ট মাজিষ্টরের নিকট হাজির হন। তিনি জবাব দিলেন,—"আমি দাঙ্গা-হাঙ্গামার কিছুই জানি না। এই দাঙ্গার সময় কলিকাতায় ছিলাম।" ইতিমধ্যে বসিরহাটের দারোগা রামরাম চক্রবর্ত্তী তদন্তের ভার লইয়া অকুস্থলে আসেন। তাঁহার তদন্তে সিদ্ধান্ত হইল, জমিদারকে ফ্যাসাদে ফেলিবার জন্যই তিতুমীরের লোকেরা নমাজ-ঘর পুড়াইয়া দিয়াছিল। এই সিদ্ধান্তের কথা শুনিয়া, তিতুমীরের লোকেরা পলায়ন করিল; তাহারা আর

আদালতে হাজির হইল না। দারোগা বলিলেন,—"জমিদারের নামে যে অভিযোগ আসিয়াছে, তাহার প্রমাণ হইল না।" তবে দারোগা মারামারির অভিযোগে উভয় পক্ষকে মাজিষ্টরের নিকট পাঠাইয়া দেন। মাজিষ্টর মোকদ্দমার ব্যাপার দেখিয়া কিংকর্ত্তব্য-বিমূঢ় হইলেন। তিতুমীরের লোকেরা বলিল,—"এই দাঙ্গা-হাঙ্গামার আঠার দিন পরে জমিদার মোকদ্দমা আনিয়াছেন; অতএব এ মোকদ্দমা চলিতে পারে না।" তাহারা দারোগাকে ঘুষখোর বলিয়া অভিযোগ করিল। সাক্ষী তলবের জন্য প্রার্থনা হইল। মাজিষ্টর কোন কথা না শুনিয়া, উভয় পক্ষকে খালাস দেন।

## তৃতীয় পরিচ্ছেদ

### তিতুর কোপ

অভিযোগে তিতুমীর ও কৃষ্ণদেব অব্যাহতি পাইলে পর, উভয়ে আপন আপন লোকজনসহ নিজ নিজ গ্রামে ফিরিয়া আসে। কোন ইংরেজ লেখক বলেন,—"অতঃপর তিতুমীরের উপর জমিদার পক্ষ হইতে নানাপ্রকার অত্যাচার হইয়াছিল। তিতুর মতাবলম্বী মুসলমানদিগকে জব্দ করিবার অভিপ্রায়ে বাকি খাজনার আদায়চ্ছলে গ্রেপ্তার করিয়া আনা হইত। দেওয়ানী আদালতে অনেক মিথ্যা অভিযোগে অনেকের উপর ডিক্রিজারি হইয়াছিল। ২৫শে সেপ্টেম্বর জয়েণ্ট মাজিষ্টরের বিচার-বিরুদ্ধে আপীল করিবার জন্য মুসলমানেরা কলিকাতায় আসিয়াছিল। জজ তখন বাখরগঞ্জে সারকুটে গিয়াছিলেন। কাজেই তাহাদিগকে বিফল-মনোরথ হইয়া ফিরিয়া যাইতে হয়।"

এ ঘটনার কথা জজ ওকনেলি সাহেবের লিখিত প্রবন্ধে উল্লিখিত আছে। অন্য কোন এদেশী লোকের মুখে বা লেখায় এরূপ কথা শুনিতে পাই না। তবে জমিদারবর্গও তখনও যেরূপ শক্তিশালী ছিলেন, তাহাতে এরূপ ঘটনা একেবারে অসম্ভব বলিয়া মনে হয় না। ফলে যাহাই হউক, তিতু পুঁড়ার জমিদারের উপর খড়্গহস্ত হইয়াছিল। তাঁহাকে জব্দ করা তাহার মুখ্য লক্ষ্য হইল।

### তিতুর সুযোগ

কাল প্রকৃতি ও প্রবৃত্তির পোষক। তিতুমীর পাশব-বলে ধর্ম্মপ্রচার করিতে চাহে। এইরূপ তাহার আজন্ম প্রবৃত্তি ও প্রকৃতি। পুঁড়ার জমিদার তাহার প্রতিরোধী ও প্রতিদ্বন্দ্বী হইয়াছিলেন। জমিদারের এইরূপ প্রতিরোধিতা ও প্রতিদ্বন্দ্বিতায় কালই সহায় হইয়াছিল। তিতুমীর পাশব-বল-উদ্দীপনার একটা হেতু

পাইল। এ হেতুর উপলক্ষে কাল আবার তিতুমীরের পাশব-বিক্রম-বর্দ্ধনের সহায় হইল।

এই সময় ইংরেজের রাজত্ব বঙ্গদেশে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল, শাসনেরও কতক ব্যবস্থা হইয়াছিল; কিন্তু শাসন তখনও সুশৃঙ্খলাবদ্ধ হয় নাই। এখনকার মত তখন শত্রুশাসনের বা বিদ্রোহ-দমনের সুতীক্ষ্ণ সূক্ষ্ম সতর্ক সাবধান বন্দোবস্তের সদ্ভাব ঘটিয়া উঠে নাই। অন্তর্বিপ্লববিনাশের ব্রহ্মাস্ত্র যে নিরস্ত্রীকরণ আইন, এ ভাব তখন ইংরেজরাজের কল্পনামাত্র স্পর্শ করে নাই। তখন তারও হয় নাই, রেলও হয় নাই, টেলিগ্রাফও হয় নাই,—ত্বরিত খবরাখবরের বিশিষ্ট-রূপ সুবিধা ছিল না। কাছে কাছে থানা ছিল না, থানায় উপযুক্ত লোকজন রাখিবার তাদৃশ সুব্যবস্থাও ছিল না। কাজেই বলিতে হইবে, কালই তিতুমীরের পাশব-বল-সঞ্চয়ের সহায় হইল।

### তিতুর বল-বৃদ্ধি

তিতু দেখিল, পুঁড়ার জমিদার কৃষ্ণদেব তাহার প্রতিদ্বন্দ্বী হইয়া মিথ্যা মোকদ্দমায় তাহার অনুগত অনুচরবর্গকে উত্যক্ত করিয়া তুলিয়াছিল। তিতু ক্রোধে উন্মত্ত হইয়া উঠিল। এইবারে তিতু বিষম বৈর-নির্য্যাতন-সঙ্কল্পে বদ্ধ-পরিকর হইয়া যুদ্ধসজ্জা করিল। বিধর্ম্মী হিন্দুদিগকে বলপ্রকাশপূর্ব্বক স্বধর্ম্মে আনিবার জন্য অনুচর-বর্গের প্রতি আদেশ হইল। খাসপুরের কোন সম্ভ্রান্ত মুসলমান তিতুর বিরুদ্ধে জমিদারকে উত্তেজিত করিয়াছিলেন। তাঁহার উপর তিতুর জাতক্রোধ হইয়াছিল।

যে ফকির আসিয়া তিতুমীরের সহিত যোগ দিয়াছিল, যে ফকিরের ঐন্দ্রজালিক কাণ্ডে তিতুর শিষ্যগণ মন্ত্রমুগ্ধ হইয়াছিল, সেই ফকিরও তিতুর সমরসহায় হইল। তাহার নাম মিস্কিন্ সাহা। এই মিস্কিন্ সাহা তিতুর আলয়ে আশ্রয় লইয়াছিল। এই সময় এই মিস্কিন্ সাহার শিষ্যগণ আসিয়া তিতুমীরের দলে যোগ দিল। দলের সকলে চাঁদা করিয়া টাকা তুলিল। তিতু সেই টাকায় চাউল এবং যুদ্ধোপকরণ কিনিয়া নারিকেলবেড়ে গ্রামে মইজউদ্দীন বিশ্বাস

নামক এক মুসলমানের বাড়ীতে জমা করিয়া রাখিল। ১৮৩১ খ্রীষ্টাব্দের ২৩শে অক্টোবর তিতুমীর আপনার দলস্থ লোকদিগকে লইয়া একটী উৎসব করিবার ঘোষণা করে। এই উৎসবচ্ছলে তাহার যাবতীয় অনুচরবর্গ সমবেত হইয়াছিল। অক্টোবর মাস শেষ হইবার পূর্ব্বেই বহুসংখ্যক লোক অস্ত্রেশস্ত্রে সুসজ্জিত হইয়া যুদ্ধার্থ প্রতীক্ষা করিতে লাগিল।

যে মইজউদ্দীন বিশ্বাসের বাড়ীতে তিতু আড্ডা লইয়াছিল, তিনি সে সময় নারকেলবেড়িয়ায় একজন সম্ভ্রান্ত ধনী মুসলমান ছিলেন। তিনি প্রথম তিতুকে আশ্রয় দিতে সম্মত হন নাই। কিন্তু অবশেষে তিতুর নানা প্রলোভনে ভুলিয়া আশ্রয় দিতে বাধ্য হইয়া পড়েন। প্যার মণ্ডল নামে আর একজন ধনী মুসলমান তিতুর প্রতিদ্বন্দ্বী হইয়াছিলেন। তিতু তাঁহাকেও নানা কৌশলে বশীভূত করিয়াছিল।

## তিতু পুঁড়াগ্রামে

তিতুর প্রথম লক্ষ্য,- পুঁড়ার জমিদার কৃষ্ণদেবের উপর। তিতু যথেষ্ট লোক-বল সংগ্রহ করিয়াছে, এই সংবাদ পাইয়া কৃষ্ণদেব বুঝিলেন, তিতু তাঁহাকেই প্রথম আক্রমণ করিবে। তিনি আর কালবিলম্ব না করিয়া কর্ত্তৃপক্ষকে সাহায্য-প্রার্থনায় আবেদন করিয়াছিলেন। কিন্তু এ আবেদনে ফল হয় নাই।

৬ই নবেম্বর প্রাতঃকালে উন্মত্ত তিতুমীর প্রায় তিন শত অনুচরসহ পুঁড়াগ্রাম আক্রমণ করিয়াছিল। তিতু আসিয়াছে শুনিয়া কৃষ্ণদেব "ফটক" বন্ধ করিয়া দেন। তিতুর লোকেরা লাঠি, সড়কি, তরবারি লইয়া প্রথমে কৃষ্ণদেবের বাড়ী ঘেরোয়া করিয়া ফেলে। বাড়ীর উপর হইতে কৃষ্ণদেবের লোকেরা মুসলমানদের উপর অজস্র ধারে ইষ্টক বর্ষণ করিতে লাগিল। তিতু তিষ্ঠিতে না পারিয়া দলবল সহ স্থানান্তরে চলিয়া গেল।

জমিদার-বাটী ত্যাগ করিয়া তিতু গ্রামের ভিতর নানা স্থানে নানারূপ অত্যাচার করিয়াছিল। যেদিন তিতু পুঁড়াগ্রাম আক্রমণ

করিয়াছিল, সেই দিন পুঁড়ায় বারোয়ারি পূজা হইতেছিল। কার্ত্তিকী পূর্ণিমা। বারোয়ারি উপলক্ষে যাত্রা হইতেছিল। তিতুমীর আসিতেছে শুনিয়া যাত্রা ভাঙ্গিয়া গেল। লোক-জন সকলে পলাইল। কেবলমাত্র পুরোহিত পূজায় ব্যস্ত ছিলেন। তিনি পলায়ন করিতে পারেন নাই। বলিতে লোমহর্ষণ হয়। তিতু বারোয়ারিতলায় উপস্থিত হইয়াই গো-হত্যা করে। পুরোহিত সে বিভীষণ বীভৎস দৃশ্য দেখিয়া উন্মত্ত হইয়া উঠিলেন। আর সহ্য করিতে না পারিয়া তিনি তৎক্ষণাৎ নিকটস্থ শাণিত খড়্গ গ্রহণ করিলেন এবং বাহ্যজ্ঞানশূন্য হইয়া প্রবলবেগে মুসলমানদিগের দিকে ধাবিত হইলেন। তখনই সেই মর্ম্মাহত অথচ নৈরাশ্যোদ্ধত ব্রাহ্মণের উলঙ্গ শাণিত খড়্গাঘাতে অনেকগুলি মুসলমানের মুণ্ড নিপতিত হইল। অনেককেই তিনি খণ্ড-বিখণ্ড করিয়া ফেলিলেন। কিন্তু একাকী অগণ্য মুসলমানের সহিত কতক্ষণ যুঝিবেন? অর্দ্ধ ঘণ্টার মধ্যে ব্রাহ্মণ মুসলমানদের হস্তে নিহত হইলেন।

এ সম্বন্ধে এইরূপ কথান্তর আছে,—বারোয়ারি পূজা হইতেছিল না; বারোয়ারি-প্রতিমা একমেটে মাত্র হইয়াছিল। তিতুমীর যে সময় বারোয়ারিতলায় উপস্থিত হয়, সেই সময় গ্রামের একজন সম্ভ্রান্ত পণ্ডিত ব্রাহ্মণ যাইতেছিলেন। তিতুমীর তাঁহাকে ধরিয়া বলে,—"তুমি আমাদের ধর্ম্মে এস; নহিলে তোমাকে কাটিয়া ফেলিব।" স্বধর্ম্ম-পরায়ণ নিষ্ঠাবান্ ব্রাহ্মণ ক্রোধে থরথর কাঁপিতে কাঁপিতে বলিলেন,—"তোদের ও পাপধর্ম্মে যাব কেন? কাট্ কাট্; —কিন্তু তোরা যদি এক কোপে কাটতে না পারিস্, তাহা হ'লে তোরা শূয়োর খা'বি।" ব্রাহ্মণের এই কথা শুনিয়া, তিতু ব্রাহ্মণের বক্ষঃস্থলে তরবারির চোপ বসাইয়া দেয়। এক কোপেই ব্রাহ্মণের বক্ষঃস্থল দ্বিখণ্ডিত হইয়াছিল। গ্রামে হাহাকার-ধ্বনি উত্থিত হইল। অনেকেই প্রাণভয়ে পলাইল। জমিদার বাবুদের লোক-জন এবং গ্রামের অন্যান্য অনেকে এ দৃশ্যে উত্তেজিত হইয়া দিগ্‌বিদিক্-জ্ঞানশূন্য হইয়া পড়িল। তখনই তাহারা সকলে মুসলমানদিগকে আক্রমণ

করিল। তিতু বুঝিল, শত্রুদিগকে পরাভব করা সহজ নহে। তখনই তিতু আপন লোকবল লইয়া সরিয়া পড়িল; কিন্তু যাইবার সময় গোমাংস টাঙ্গাইয়া পবিত্র মন্দির অপবিত্র করিয়াছিল; অধিকন্তু যাইবার পথে দুইজন ব্রাহ্মণকে পাইয়া তাঁহাদেরও মুখে মাংস গুঁজিয়া দিয়াছিল। কেবল ইহাই নহে, তিতুর লোকেরা বাজারের মধ্যস্থলে একখণ্ড মাংস টাঙ্গাইয়া দিয়া বিষম বীভৎস দৃশ্যে হিন্দু নরনারীর প্রাণে আঘাত করিল।

অতঃপর তিতু বাজারের দোকান-পাট লুঠ করিয়া লইল। এই সময় একজন দেশী খৃষ্টান পথ দিয়া যাইতেছিল, তিতু তাহাকে ধরিয়া অপমান করে। যে সকল মুসলমান তাহার দলভুক্ত হয় নাই, তাহারাও নানারূপে লাঞ্ছিত হইয়াছিল।

### তিতুর জিঘাংসা

তিতু এমন হইল কেন? অনাহূত উত্তেজনা তিতুকে জিঘাংসা-পরায়ণ করিল। তিতু আপন ধর্ম্মমত প্রচার করিতেছিল। সে প্রচারে পীড়ন-তাড়ন ছিল না। লোকে তাহার বাগ্বিন্যাসে মুগ্ধ হইয়া, তাহার প্রচারে স্তম্ভিত হইয়া, তাহার মতকে সত্য ভাবিয়া, তাহাকে পরিত্রাতা মনে করিয়া, তাহার মতাবলম্বী হইয়াছিল এবং তাহার মন্ত্রগ্রহণ করিয়াছিল। তিতু প্রথমতঃ শোণিতের বিনিময়ে প্রচারসিদ্ধি করিতে চাহে নাই। জমিদার কৃষ্ণদেব জরিমানার ব্যবস্থায় তাহার শান্ত প্রচারে হস্তক্ষেপ করিল। তিতুর প্রবৃত্তি প্রকৃতপক্ষে শান্তি-রসাভিষিক্ত নহে। তিতুর শিক্ষাও শান্তির পক্ষপাতিনী নহে। তাহা হইলে, তিতু জমিদারের ব্যবস্থাকে অযথোচিত মনে করিয়া, তাহার শাসনভার স্বয়ং গ্রহণ করিত না। শান্তির ধর্ম্ম,—সহিষ্ণুতা। সে সহিষ্ণুতা না থাকিলেও, সংযমকে প্রতিশোধের প্রকৃতি বোধ করিয়া, তিতু রাজার আশ্রয় লইতে পারিত। আর এক কথা, কৃষ্ণদেবই তাহার শত্রু। সে শত্রুকে শাসন করিতে না পারিয়া সাধারণ নির্দ্দোষ নিরীহ লোকের উপর অত্যাচার করা, তিতুর অশান্তি প্রবণতার পরিচায়ক নহে কি? তিতু জিঘাংসাপরায়ণ হইল। তিতু জিঘাংসায় পরধর্ম্ম অসহ্য

ভাবিয়া নির্দ্দোষ নিরীহ ব্যক্তির উপর অত্যাচার করিল। তিতু রাজবিদ্রোহী হইল। রাজবিদ্রোহে তিতু আত্মনাশের বীজ বপন করিল। তিতু রাজার আশ্রয় লইলে সুবিচার পাইত। সুবিচারে নিশ্চিতই প্রচারও অব্যাহত হইত।

## তিতুর স্পর্দ্ধা

এইবার তিতুর অহমিকা চরমে চড়িল। দুর্ব্বুদ্ধি তিতুমীর ঘোষণা করিল,—"কোম্পানীর লীলা সাঙ্গ হইয়াছে। ইউরোপীয়েরা অন্যায়-পূর্ব্বক মুসলমানের রাজত্ব আত্মসাৎ করিয়াছে। চির উত্তরাধিকারিত্ব-সূত্রে মুসলমানই এদেশের রাজা। আমিই রাজা।"

চারিদিকে তিতুর বিজয় বিঘোষিত হইল। তিতু মনে করিল, আমি সসাগরা পৃথিবীর একচ্ছত্রী রাজা। এইবার রীতিমত যুদ্ধের আয়োজন হইল। তিতুর স্পর্দ্ধা বাড়িল। তিতু ভারতেশ্বররূপে জমিদারবর্গের নিকট করপ্রার্থী হইল। গোবরডাঙ্গা ও অন্যান্য স্থানের জমিদারদিগের নিকট সংবাদ গেল,—"কর দাও। তোমরা যদি আমার আধিপত্য স্বীকার না কর, আর দস্তুরমত কর না দাও, তাহা হইলে কাটিয়া ফেলিব।" প্রবলপ্রতাপান্বিত জমিদারেরা তিতুর স্পর্দ্ধা দেখিয়া ক্রোধে বিধূম-বহ্নিবৎ জ্বলিয়া উঠিলেন। এই সময় কালীপ্রসন্ন মুখোপাধ্যায় গোবরডাঙ্গার জমিদার ছিলেন। কলিকাতার লাটুবাবুর সহিত কালীপ্রসন্ন বাবুর সৌহার্দ্দ ছিল। এই লাটু বাবু কালীপ্রসন্ন বাবুর সাহায্যার্থ দুই শত হাবসী পাঠাইয়াছিলেন। কালীপ্রসন্ন বাবুর নিজেরও তিন চারি শত লাঠিয়াল, পাইক, ও কয়েকটি হস্তী প্রস্তুত ছিল। কালীপ্রসন্ন বাবু স্পর্দ্ধা সহকারে তিতুকে কর দিতে অস্বীকার করেন। তিতু দেখিল, কালীপ্রসন্ন বাবুর লোক-বল প্রবল; সুতরাং তিতু গোবরডাঙ্গায় অগ্রসর হইতে পারিল না। তবে তিতু এই বলিয়া কালীপ্রসন্ন বাবুকে শাসাইয়া রাখিয়াছিল—"একদিন তোমার জ্যেষ্ঠা স্ত্রীকে নিকা করিব। তোমার কালীমন্দিরে গোহত্যা করিব। ব্রাহ্মণ বিধবাদিগের নিকা দিয়া তাহাদের হাতের ব্যঞ্জন খাইব।"

## তিতুর জয় ও পরাজয়

কালীপ্রসন্ন বাবু নিশ্চিন্ত ছিলেন না। তখনও বাঙ্গালী হিন্দু জমিদারের আত্মমর্য্যাদা লোপ পায় নাই। তিতুর ধ্বংস-সাধনই তাঁহার একান্ত পণ হইল। কালীপ্রসন্ন বাবুর চেষ্টায় মোল্লাহাটী কুঠির ম্যানেজার ডেভিস্ সাহেব প্রায় দুই শত লাঠিয়াল ও সড়কিওয়ালা সহ তিতুকে আক্রমণ করিতে গিয়াছিলেন। তিতু পূর্ব্বে ইহার সন্ধান পাইয়াছিল; সুতরাং পূর্ব্ব হইতেই লোক-জন সংগ্রহ করিয়া রাখিয়াছিল। ডেভিস্ সাহেব তিতুকে আক্রমণ করিতে গিয়া আক্রান্ত হন। সাহেব বজরা করিয়া গিয়াছিলেন। তিতু সবেগে সেই বজরা টানিয়া ডাঙ্গায় তুলিয়া খণ্ড খণ্ড করিয়া ফেলে। সাহেব পলায়ন করেন। তাঁহার অনেক লোক হত এবং অনেকে আহত হইয়াছিল। অনেকে গোবরা গোবিন্দপুরে আশ্রয় লইয়াছিল। এই সময়ে ঐ গ্রামের জমিদার রায় মহাশয়দের সহিত তিতুমীরের বিবাদ বাধে। বিবাদ পাকিয়া উঠিল। তিতু পাঁচ-ছয় শত লোক লইয়া গ্রাম আক্রমণ করিল।[৫] রায় মহাশয়েরা লোক-জন লইয়া তিতুর গতিরোধের চেষ্টা করিলেন। তিতুর যে সকল লোক নদীর কিনারায় উঠিয়াছিল, তাহারা রায় মহাশয়দের অস্ত্রাঘাতে হত হইল। রক্তের স্রোতে ইছামতী নদী লালবর্ণ হইয়া উঠিল। তিতু বেগতিক বুঝিয়া পলায়ন করিল। এই লড়াইয়ে তিতু এতদূর বিপন্ন হইয়াছিল যে, তাহাকে জীবিত দেখিয়া তাহার অনুচরেরা তাহাকে ঈশ্বর-প্রেরিত মনে করিয়াছিল। তিতুর ভক্ত শিষ্যদিগের মধ্যে এইরূপ জনরব উঠিয়াছিল যে, তাহারা তিতুকে ইছামতী নদী পার হইতে দেখিয়াছিল। এই লড়াইয়ে যে সাহসী রায় মহাশয় তিতুকে পরাজিত করিয়াছিলেন, তিনি সাংঘাতিক আঘাত পাইয়াছিলেন। সেই আঘাতেই তাঁহার মৃত্যু হয়।

## তিতুর যুদ্ধে বাঙ্গালী বীর

যে রায় মহাশয় হত হইয়াছিলেন, তাঁহার নাম দেবনাথ রায়।

---

৫ কেহ কেহ বলেন, এ যুদ্ধ লাউঘাটিতে হইয়াছিল।

ইনি রতিকান্ত রায়ের পুত্র। দেবনাথ কয়েকজন সম্ভ্রান্ত সাহসী লোককে সঙ্গে লইয়া তিতুমীরের সহিত অসম সাহসে যুদ্ধ করিয়াছিলেন। তিনি বাত-বেগগামী অশ্বে আরোহণ করিয়া সদর্পে তিতুকে আক্রমণ করেন। উভয় দলে ঘোরতর যুদ্ধ হয়। দেবনাথের অব্যর্থ তরবারি-আঘাতে খিদির খাঁ নামক জনৈক সর্দ্দারের বামবাহু খণ্ড-বিখণ্ড হইয়া গিয়াছিল। খিদির খাঁ আহত হইয়া পলাইয়া যায়। সেই সময় রণমদোৎকট দেবনাথ রণ-চণ্ডবেশে অমোঘ-বিক্রমে অনেক মুসলমানকে হত ও আহত করিয়াছিলেন। অতঃপর খিদির অলক্ষ্যে আসিয়া দেবনাথের অশ্বের দক্ষিণপদে সজোরে লাঠির আঘাত করিয়াছিল। অশ্ব দেবনাথকে লইয়া ভূতলে বিলুণ্ঠিত হইয়াছিল। দেবনাথ ভূতলে পড়িয়া উঠিবার চেষ্টা করিয়াছিলেন; কিন্তু ভীম অশ্বের ভীষণ চাপে তাঁহার এক খানি পা মৃত্তিকায় বসিয়া গিয়াছিল; সুতরাং তিনি আর উঠিতে পারেন নাই। সহসা একজন যবন উলঙ্গ অসিহস্তে বিদ্যুদ্বেগে ছুটিয়া আসিয়া দেবনাথের কণ্ঠচ্ছেদ করিয়া ফেলিয়াছিল। বীর দেবনাথ বীরোচিত জীবন বিসর্জ্জন করিয়াছিলেন।

মুসলমান লেখক "সাজন গাজি" লিখিয়াছেন, এই যুদ্ধ লাউ-ঘাটিতে হইয়াছিল। সাজন গাজির বর্ণিত যুদ্ধ-বর্ণন এইখানে উদ্ধৃত হইল,—

### যুদ্ধ বর্ণনা

"লাউঘাটি ছিলো নামে সাকের সর্দ্দার।
মমিন পৌঁছিল গিয়া পায় সমাচার॥
গোরু জবে কোরে খানা তৈয়ার করিল।
আছুদা করিয়া খানা সবে খেলাইলো॥
খানা খেয়ে মমিনেরা আছুল বসিয়া।
হরিদেব দেবরায় খবর পাইয়া॥
তিন চারি শত লোক সঙ্গে লিয়া তারা।
লড়িতে আইলো গিধি করিয়া পৈতারা॥

ভুরি পেচা খেলে তারা জতো জোন জোন।
উড়া সন্নিপাকে খেলে খোসালিত মোন ॥
জখোন থাকিলো তারা মার মার বলি।
মেঘের বেজলি জেনো কর্ণে লাগে তালি ॥
শব্দ হইল জেনো সিংহের গর্জনে।
আওয়াজের ধোমকে কম্পিত কতো জোন ॥
ডাইন দিগে তলওয়ার বাম হাতে ঢাল।
চলে পতে চারি দিগে ফেরে মস্ত হাল ॥
এসে চারি দিঘে ঘেরে মমিন সবারে।
মমিন ফরয়াদ করে আল্লার দরবারে ॥
মার্ মার্ বলি তারা মারিলো তলওার।
জোরেতে মারিল চোট ছেবেনজিবেল্লার ॥
লাএলাহা কল্‌মা পড়ি জতো দিনদারে।
তেরিজ হইয়া কোপ ধরে লাটি পরে ॥
সামলিল কোপ কেহ এসে ঝটপটি।
বেদিনের পরে তবে ফেঁকে মারে লাটি ॥
লাটি খেয়ে ঢালে সেহো খাড়া হইয়া ছিলো।
সরাওয়ালা পুনর্ব্বার লাটি জে মারিলো ॥
কবজা করিয়া সল লাটি আপনার।
মারিল চিকরে লাটি পড়ে ছেরে তার ॥
মার্ মার্ ধর্ ধর্ করে জোবেদিনে ॥
সরাওালা কলমা পড়ে আপন জবানে।
তাড়াতাড় লাটি মারে জতো মমিনেতে ॥
কারোবা ভাঙ্গিলো ছের কারো লাগে হাতে।
কান পাটি ভাঙ্গে কারো ভেঙ্গে গেল দাঁত ॥
বাবা বাবা বোলে পড়ে মুখে দিয়া হাত।
সরাওয়ালা কলমা পোড়ে জোরে মারে লাটি ॥
কারোবা ভাঙ্গিলো হাড় কারবা কানপাটি।
ঘাএল বেদিন এক মএদানে পড়িলো ॥
মমিন ধরিয়া তারে লস্করে আনিলো।
সড়োগওয়ালা ছিলো জারা জথম হইল।
লাটি খেয়ে বাজে লোগ ভাগিতে লাগিল ॥"

অতঃপর তিতু অধিকতর বল-সঞ্চয়ে প্রবৃত্ত হইল। তিতু তখন স্বপ্নের রাজ্যে সমগ্র ভারতের উপর শাসনদণ্ড পরিচালিত করিতে-ছিল। ফকির তখনও তাহার পরম সহায়। দেখিতে দেখিতে তিতুমীরের দলে সহস্রাধিক লোক জুটিল। অতঃপর তিতু নানা স্থান হইতে নানা-প্রকারে খাদ্য-সংস্থান করিতে লাগিল। ফকির বলিয়াছিল,—"গোলাগুলিতে আমাদের কি হইবে? আমি গোলা-গুলি টপ্ টপ্ করিয়া গিলিয়া ফেলিব।" তাহার দুই একটা ভেল্কী-বাজীর খেলায় সকলের এইরূপ বিশ্বাসও বদ্ধমূল হইয়া গিয়াছিল। সকলেই উত্তেজিত ও উদ্দীপিত। সকলেই লাঠি, সড়কি, কাস্তে, কুঠার প্রভৃতি অস্ত্রশস্ত্রে সজ্জিত। হায়! মোহ!

## চতুর্থ পরিচ্ছেদ

### তিতুর অত্যাচার

পঞ্চ-শতাধিক লোক তিতুর শিষ্যত্ব গ্রহণ করিয়াছিল। ক্রমেই তিতুর বলবৃদ্ধি হইতে লাগিল। বলবৃদ্ধি হইল বটে; কিন্তু তাহার শিষ্যানুচরগণ গ্রামবাসীদের উপর অত্যাচার করিতে আরম্ভ করিল। অনেককে তাহারা গোস্ত খাওয়াইয়া স্বধর্ম্মে টানিয়া লইল। হিন্দুর "জাতি-ধর্ম্ম" নষ্ট করাই যেন তাহাদের কর্ত্তব্য বলিয়া সিদ্ধান্ত হইল। তিতু আত্মহারা হইল। তিতু লক্ষ্যভ্রষ্ট হইল।

হিন্দুকে জোর করিয়া, গোস্ত খাওয়াইয়া, মুসলমান করিলে, প্রকৃত নিষ্ঠাবান স্বধর্ম্ম-পরায়ণ শিক্ষিত সম্ভ্রান্ত মুসলমান-সম্প্রদায় আনন্দানুভব করেন না; বরং ইহাতে তাঁহাদের রাগ ও ঘৃণা হইয়া থাকে। নিম্নশ্রেণী অশিক্ষিত মুসলমানের কথা স্বতন্ত্র। তিতু যে সকল হিন্দুকে মুসলমান করিয়াছিল, তাহাদিগের প্রসঙ্গে সাজন গাজি কিরূপ ব্যঙ্গোক্তি করিয়াছেন, শুনুন,—

বামনের মেয়ে এনে, নেকা দেয় কতো জোনে,
সাঁকা ভাঙ্গি হাতে দিল চুড়ি।
বামনগোনেবে ধোরে, কল্‌মা পড়ায় জোরে,
চুল ফেলে মুখে রাখে দাড়ি॥
গাওা গোস্ত তারা খাইয়া, কাপড় পরে ওন্দারা দিয়া,
কাছা খুলে সবে গেলো বাড়ি।
গাল পাট রাখিয়া দাড়ি, সবে যায় নিজ বাড়ি,
দেখে তারে কহেন ব্রাহ্মণি॥
মাথায় দেখিনা কেস, ধোরেছো মুছল্লি-বেশ,
বুঝি তোদের গেছে হিন্দুয়ানি।

কি ভাব হৈয়াছো রায্য, কহ দেখি ভট্টাচার্য্য,
চুল ফেলে মুখে কেন দাড়ি ॥
পৈত্তা কোথায় থুলে, ফেলিয়াছ কাছা খুলে,
জায়গা পাবে না আমার বাড়ি।
খেয়েছো বাপের কলা, কেন হৈলে সরা ওলা,
ঘর কন্না সব দিলে ছেড়ে ॥
কোরেছো ইমান দড়ো, পাঁচ অক্ত নামাজ পড়ো,
ফিরে তুমি জাও নারিকেলবেড়ে।
জোগের জে পৈতে গলে, তা তুমি ফেলেছো জলে,
গো মাংস কি তাও এমন মিটে ॥
গিয়া ফকিরের কেল্লা, হৈয়াছো দেড়ে মোল্লা,
ঘরে এলে করবো ক্ষেঙরা পিটে।
কেমন বচন শুনি, কি বলিলি ব্রাহ্মনি,
এতো দুঃখ ছিলো আমার ভালে ॥
ফাঁকি দে আমার তরে, কল্মা পড়াযে জোরে,
গাওা গোস্ত দিলো মোর গালে।
লোক ছিল আগু পিছু, . তা আমি গিলিনি কিছু,
দূরে গিযে ফেল্লাম তাডাতাডি ॥
কল্মা শুনিতে পাই, তাহা আমি সিখি নাই,
ধোবে বেন্দে বেথে দেছে দাড়ি।
ব্রাহ্মনি কহেন ফিরে, মুছল্লিকে কি খাতিরে,
ঠাট্টা জে করিলে সোমাতুল ॥
বলেছিলাম ব্রাহ্মন, ঘে টাইওনা কাল জবন,
একেবারে জাবে জাতি কুল।"[৬]

ধর্ম্মমদোৎকট তিতু জিঘাংসায় দিশেহারা হইয়াছিল। জিঘাংসায় তিতু মানবধর্ম্ম ভুলিয়া গিয়াছিল। তিতুর অনুচরেরা অন্যরূপ হইবে কিরূপে? আহত শত্রু হিন্দু ব্রাহ্মণ রণক্ষেত্রে পড়িয়া

৬ ১২৭৭ সালের ৯ই ভাদ্র এই পদ্য মুদ্রিত হয়। যেথানে যেমন ভাবাটী, যেমন বানানটী, যেমন চিহ্নটী আছে, অবিকল উদ্ধৃত হইল। ইহা তদানীন্তন মুসলমানী বাঙ্গালা সাহিত্যের অন্যতম নমুনা।

পিপাসিত কণ্ঠে জল চাহিল, তিতুর অনুচরেরা তাহার মুখে গোস্ত গুঁজিয়া দিল। এ সম্বন্ধে মুসলমান লেখক মৃত সাজন গাজি কি লিখিয়াছেন, শুনুন,—

"পড়িলো মএদানে লোক লাঠির আঘাতে।
ব্রাহ্মণ ছিলো সেহো হিন্দুদের জেতে॥
এবে তবে সনো সেই ব্রাহ্মণের বাণি।
পিয়াছা আছিল সেই চাহিলেক পানি॥
গাওা গোস্ত সবাওালা এনে কহে তারে।
ভোক্তি করে খাও ঠাকুর ফকিবের ঘরে॥
নাচার হইলো বামন পোড়ে কাবুতলে।
লাএলাহা এল্লেল্লেহা কল্‌মা মুখে বলে॥
বাওন বলে ধোবে তোলো গায় নাহি বল।
পিয়াছেতে ছাতি ফাটে একটু দেও জল॥
বিপাকে পড়িযা গোস্ত করিল ভক্ষণ।
সাজন বলে ছিলো তোর অদেষ্টে লিখন॥"

এ ব্যাপারে মুসলমান লেখকেরও সহানুভূতি নাই। কোন্ স্বধর্ম্মপরায়ণ শিক্ষিত সম্ভ্রান্ত মুসলমানের সহানুভূতি থাকিতে পারে?

তিতু এবং তাহার অনুচরবর্গের অত্যাচারে গ্রামবাসিগণ গৃহদ্বার পরিত্যাগ করিয়া সপরিবারে স্থানান্তরে পলায়ন করিতে লাগিল। নবাব আলিবর্দ্দীর সময় বর্গীর হাঙ্গামার ভয়ে গঙ্গার পশ্চিম তীরবর্ত্তী স্থানসমূহের অধিবাসীরা গৃহদ্বার পরিত্যাগ করিয়া গঙ্গার পূর্ব্বপারবর্ত্তী স্থানসমূহে আশ্রয় লইয়াছিল। তিতুর হাঙ্গামাভয়ে গ্রামবাসীদের অনেকে বারাসতে, অনেকে গোবরডাঙ্গায় এবং অনেকে কলিকাতায় পলাইয়া আসিয়া আশ্রয় লইয়াছিল। বর্গীর হাঙ্গামায় যেমন অনেক জমিদারকে সর্ব্বদা শঙ্কিত হইয়া থাকিতে হইত, তিতুর সময় অনেক জমিদারের সেইরূপ অবস্থা হইয়াছিল। এই সকল জমিদারদের অনেক প্রজা তিতুর দলভুক্ত হইয়া জমিদার-দিগকে গ্রাহ্য করিত না; এমন কি, অনেকেই খাজনা দেওয়া বন্ধ

করিয়াছিল। খাজনা না পাউন, তাঁহাদিগকে নিজ নিজ পরিবারের "মান-ইজ্জৎ" লইয়া ব্যতিব্যস্ত হইতে হইয়াছিল।

১৮৩১ খ্রীষ্টাব্দের ১৪ই অক্টোবর তিতু খাসপুরের একটী সম্ভ্রান্ত মুসলমানের বাড়ী লুঠ করিয়া তাঁহার একটী কন্যার সহিত আপনার দলের এক প্রধান ব্যক্তির বলপূর্ব্বক বিবাহ দিয়াছিল। ইতিপূর্ব্বে রায় বাবুদের হত্যাকাণ্ডে তদন্ত করিতে আসিয়া থানার দারোগা তিতুর হস্তে লাঞ্ছিত হইয়াছিলেন। তিতু রামচন্দ্রপুর ও হুগলী লুণ্ঠন করিয়াছিল।

## তিতুর শাসন-চেষ্টা

তিতুর অত্যাচার যে চরমে উঠিয়াছে, এ পর্য্যন্ত কর্ত্তৃপক্ষদের সে ধারণা ছিল না। নদীয়া এবং বারাসত জেলা তিতুর কার্য্যক্ষেত্র হইয়াছিল। এই সময় এই দুই জেলায় অনেকগুলি নীলকুঠি প্রতিষ্ঠিত ছিল। যশোহর-বাগাণ্ডির "নেমক-পোক্তান", তিতুর কার্য্যক্ষেত্র হইতে বহুদূরে ছিল না। ২৮শে অক্টোবর বারাসতের মাজিষ্টর সংবাদ পাইয়াছিলেন, তিতুর বহুসংখ্যক অনুচর নারকেল-বেড়িয়া গ্রামে জমায়েৎ হইয়াছে। কালেক্টর সাহেব ব্যাপার গুরুতর ভাবেন নাই। তিনি ভাবিয়াছিলেন, দুই জন বরকন্দাজে শত্রু দূরীকৃত হইবে। কয়েক দিন আর কোন সংবাদ পাওয়া গেল না। ১১ই নবেম্বর কলেক্টর সাহেব সংবাদ পাইলেন, তিতুমীর অনেক লোককে মারিয়া ফেলিয়াছে। ইতিপূর্ব্বে বসিরহাটের দারোগা সংবাদ পাঠাইয়াছিলেন, তিতুমীরকে শাসন করা দুঃসাধ্য হইয়া উঠিয়াছে। কলেক্টর সাহেব দারোগার সাহায্যার্থ তিন জন জমিদার এবং একত্রিশ জন বরকন্দাজ পাঠাইয়াছিলেন।

১১ই এবং ১২ই নবেম্বর নারকেলবেড়ের নিকটস্থ নীলকুঠির এজেণ্ট পাইরন্ সাহেব কলিকাতার প্রভু ষ্টরম্ সাহেবকে তিতুমীরের অত্যাচারের কথা লিখিয়া পাঠান। ষ্টরম্ সাহেব নদীয়া ও বারাসতের মাজিষ্টরকে চিঠি লিখেন। অধিকন্তু তিনি পাইরনের চিঠিখানি ডিপুটী গবরণরের নিকট প্রেরণ করেন। এত বড় যে

একটা বিদ্রোহ হইতে পারে, গবরমেণ্ট তাহা বিশ্বাস করেন নাই। কিন্তু যখন নদীয়া ও বারাসতের মাজিষ্টর লিখিয়া পাঠাইলেন, তখন গবরমেণ্ট আর নিশ্চিন্ত থাকিতে পারিলেন না।

## তিতুর যুদ্ধ

বিদ্রোহ-দমনের উদ্যোগ হইল। বাগাণ্ডির "নেমোক-পোক্তানে" গবরমেণ্ট কলিকাতা হইতে সিপাহী পাঠাইয়া দিলেন। মাজিষ্টর আলেকজেন্দার সাহেবের উপর হুকুম হইল, তিনি যেন বাগাণ্ডিতে গিয়া এই সিপাহীদের সহিত যোগ দেন। মাজিষ্টর সাহেব বসিরহাটে গিয়া ব্যবস্থা করিলেন, যখন বিদ্রোহীদিগকে আক্রমণ করা হইবে, তখন দারোগা ও বরকন্দাজেরা যেন যোগ দেয়। এই বলিয়া মাজিষ্টর সাহেব বাগাণ্ডি গমন করিলেন।

বাগাণ্ডির "নেমোক-পোক্তানে" সিপাহী ছিল। ১৪ই নবেম্বর প্রাতে মাজিষ্টর আলেকজেন্দার সাহেব, একজন হাবিলদার, একজন জমাদার এবং কুড়িটি সিপাহীসহ বিদ্রোহীদিগকে আক্রমণ করিতে অগ্রসর হন। বেলা ৯টার সময় সাহেব সদলবলে বাদুড়িয়ায় উপস্থিত হইলেন। বাদুড়িয়া হইতে বিদ্রোহীর আড্ডা তিন ক্রোশ মাত্র দূরে অবস্থিত ছিল। দারোগা এবং বরকন্দাজেরা আসিয়া সাহেবের সহিত যোগ দিল। সাহেবের পক্ষে ১২০ জন লোক সমবেত হইয়াছিল। পরে সাহেব বিদ্রোহীর অনুসন্ধানে প্রবৃত্ত হন। সাহেব দেখিলেন, পাঁচ ছয় শত বলিষ্ঠ বীর্য্যবান্ লোক সুসজ্জিত হইয়া, নারকেলবেড়িয়ার সম্মুখস্থ ময়দানে দণ্ডায়মান রহিয়াছে। গোলাম মাসুম অশ্বারোহণে এই সব অস্ত্র-সজ্জিত তিতুর সেনাদিগের পরিচালনভার লইয়াছিল। আত্ম-দম্ভোন্মত্ত তিতুর সেনারা, সেনানীর অগ্নিবর্ষি উৎসাহ-বাক্যের জ্বলন্ত দীপক রাগে উদ্দীপিত হইয়া, "আল্লা হো, আল্লা হো" শব্দে গগন-মেদিনী প্রকম্পিত করিয়া তুলিল।

তিতুর রণসজ্জা দেখিয়া সাহেব চকিত, ভীত ও স্তম্ভিত হইলেন। সাহেব বুঝিলেন, তিতু প্রকৃতই প্রবল বিদ্রোহী। তবুও কিন্তু তিনি

মনে করিয়াছিলেন, ইংরেজের সিপাহী দেখিয়া, তিতুর লোকেরা ভয়ে পলাইবে। পলাইবে কি, সাহেবকে সসৈন্যে উপস্থিত দেখিয়া, সেনাপতি গোলাম মাসুম, জলদগম্ভীর নাদে বলিলেন,—"ঐ সাহেব, ঐ সাহেব,—মার্ মার্।" এই বলিয়া মাসুম হস্তস্থিত সড়কী ঘুরাইয়া বিদ্যুদ্বেগে সিপাহীদিগের দিকে ধাবিত হইল। মুহূর্ত্তে শ্রবণভৈরব গগনবিদারী "আল্লা হো, আল্লা হো" রবে তিতুর সৈন্যগণ ছুটিল।

## তিতুর জয়

তিতুর সৈন্যদিগকে অগ্রসর হইতে দেখিয়া, সাহেব স্বয়ং অগ্রসর হইলেন এবং তাহাদিগকে দুটো মিষ্ট কথায় তুষ্ট করিবার চেষ্টা করিলেন। কিন্তু তখন তাঁহার কথা কে শুনে? বিনা রক্তপাতে বিদ্রোহ-দমন কবিবার আকাঙ্ক্ষায় সাহেব, সিপাহীদিগকে বন্দুকে ফাঁকা টোটা ব্যবহার করিয়া, ফাঁকা আওয়াজ করিতে বলিয়াছিলেন। সিপাহীরা তাহাই করিল। কিন্তু ফলে তাহাতে কিছুই হইল না। ক্ষুধিত সিংহ যেমন মেষের উপর লম্ফ প্রদান করিয়া আক্রমণ করে, তিতুর সেনাগণও সেইরূপ সিপাহীদিগকে আক্রমণ করিল। দূর হইতে সিপাহীদের উপর অবিরল ধারে ইষ্টক বর্ষণ হইতে লাগিল। সিপাহীরা অস্থির হইয়া পড়িল। অনেকে হত ও আহত হইল। ভাদ্র মাসের বায়ুতাড়িত পাকা তালের মতন সিপাহীদের মুণ্ড ভূতলে নিপতিত হইতে লাগিল। মাসুম মুক্ত তরবারির আঘাতে অনেককে খণ্ড খণ্ড করিয়া ফেলিল। কলিকাতার জমাদার, দশ জন সিপাহী এবং তিন জন বরকন্দাজ নিহত হইল। বসিরহাটের দারোগা, কলিঙ্গা থানার জমাদার এবং অন্যান্য সিপাহীদিগকে বিদ্রোহীরা বন্দী করিল।

আলেকজেন্দার সাহেব বেগতিক দেখিয়া দ্রুত অশ্বারোহণে পলায়ন করিলেন। সাহেব এখন দিগ্বিদিক-জ্ঞানশূন্য। কোন্ দিকে কোন্ পথে ঘোড়া ছুটিতেছে, তাহার ঠিক নাই। ঘোড়া যথেচ্ছ দৌড়িতে দৌড়িতে ভড়ভড়িয়ার খালে পড়িয়া কর্দ্দমে

প্রোথিত হইল। সাহেব কর্দ্দমাক্ত কলেবরে ভীত-চিত্তে মুমূর্ষু প্রায় হইলেন। কলিঙ্গার কয়েকজন ব্রাহ্মণ তাঁহার তাদৃশী শোচনীয় অবস্থা দেখিয়া তাঁহাকে কর্দ্দম হইতে উদ্ধার করেন এবং ধীরে ধীরে তাঁহাকে আপনাদের গ্রামে লইয়া যান। পরে গ্রামের ভদ্র-লোকেরা, যথোচিত আহার-পানীয়ে তাঁহার শুশ্রূষা করিয়া, তাঁহাকে বাগাণ্ডিতে পৌঁছিয়া দিয়া আইসেন।

## তিতুর বৈরনির্য্যাতন

এদিকে বসিরহাটের দারোগাকে হস্তগত করিয়া তিতুমীর তাঁহাকে মুসলমান হইতে বলে। তিনি নিষ্ঠাবান ও স্বধর্ম্মপরায়ণ। তিতুর কথা শুনিয়া, ক্রোধে তাঁহার চক্ষু রক্তবর্ণ হইয়া উঠিল। তিনি প্রহত ফণীর ন্যায় গর্জ্জন করিয়া বলিলেন,—"শূয়োরখেগো পাতিনেড়ে! তুই আগে শূয়োর খা, তবে আমাকে গোস্ত খাইতে বলিস্।" তিতু জ্বলিয়া উঠিল। তখনই হুকুম হইল,—"মাসুম, এখনই ইহাকে খণ্ড খণ্ড করিয়া কাটিয়া ফেল।" মাসুম তখনই দারোগাকে বন্ধন করিয়া একটা ধান্যক্ষেত্রে লইয়া যায় এবং তথায় তাহাকে একটা আইলের উপব ফেলিয়া তাহার হাত, পা ও নাক কাটিয়া দেয়। শেষ তরবারির এক আঘাতে দারোগার প্রাণবায়ু নিঃসারিত হয়। দারোগা ধর্ম্ম পরিত্যাগ করেন নাই,—প্রাণভিক্ষাও চাহেন নাই। এই দারোগাই পুঁড়ার হাঙ্গামার মোকদ্দমার তদন্তে গিয়াছিলেন। তিতুর বিশ্বাস ছিল, ইনি কৃষ্ণদেবের আত্মীয়, সেইজন্য ইনি কৃষ্ণদেবের পক্ষ সমর্থন করিয়াছিলেন এবং সেই জন্য মোকদ্দমায় তাঁহার জয় হয় নাই। এতদিনে বৈর-নির্য্যাতন হইল। কলেক্টর সাহেব পলাইলে, দারোগা পাল্কী করিয়া পলায়ন করিয়াছিলেন; কিন্তু তিতুমীরের লোকে তাঁহাকে ধরিয়া ফেলিয়াছিল।[৭]

---

৭ এই দারোগা সম্বন্ধে বহুতত্ত্বদর্শী সুবিজ্ঞ সুলেখক শ্রীযুক্ত ত্রৈলোক্যনাথ মুখোপাধ্যায় মহাশয় ( T. N. Mukerjee ) নিম্নলিখিত কয়েকটী কথা লিখিয়া পাঠাইয়াছেন—

(১) ইঁহার জন্মস্থান, নৈহাটী থানার অধীন মূলাযোড় (শ্যামনগর) ষ্টেশনের

## তিতুর আধিপত্য

কলেক্টরকে পরাজিত করিয়া তিতুর সাহস বাড়িয়া গেল। ক্রমে দলও বাড়িতে লাগিল। দেখিতে দেখিতে প্রায় সাত আট হাজার মুসলমান তাহার দলভুক্ত হইল। তিতু নিকটস্থ নীলকর সাহেবদের কুঠি লুটিয়া আপনার আধিপত্য বিস্তার করিল। কুঠিয়াল সাহেবগণ কুঠি ফেলিয়া সপরিবারে কলিকাতায় পলায়ন করিলেন।

এই সময় একদিন পুঁড়া ও সারগাছীর কয়েকজন ভদ্রলোক নিমন্ত্রণ রক্ষা করিবার জন্য চৌরাশী যাইতেছিলেন। পথে তাঁহারা তিতুর লোকদিগকে দেখিয়া পলায়ন করিতে আরম্ভ করেন। তিতুর লোকেরা তখনই "আল্লা হো" "আল্লা হো" শব্দে তাঁহাদিগের

---

নিকট রাহুতা গ্রামে। ভবানীপুরের সুপ্রসিদ্ধ ৺রূপচাঁদ মুখোপাধ্যায়, দাওয়ান ৺নিমাইচরণ মুখোপাধ্যায়, জয়পুরের শ্রীকান্তিচন্দ্র মুখোপাধ্যায় শ্রীরঙ্গলাল মুখোপাধ্যায়, শ্রীত্রৈলোক্যনাথ ( T. N. Mukerjee ) প্রভৃতি এই গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। অনেক বীরপুরুষ ও কৃতবিদ্য লোক এই গ্রামে জন্মগ্রহণ করিয়াছেন, সেজন্য "রাহুতার মাটীর গুণ" এইরূপ প্রবাদ নিকটস্থ লোকের মুখে শুনিতে পাওয়া যায়। কিন্তু ম্যালেরিয়ার প্রভাবে গ্রামটি এখন জনশূন্য জঙ্গল হইয়া গিয়াছে।

(২) দারোগার নাম ছিল, রামরাম চক্রবর্ত্তী। গ্রামের লোকে তাঁহাকে "মেটে চক্রবর্ত্তী" বলিয়া ডাকিত।

(৩) মুসলমান হইতে অস্বীকার করিলে, তিতুমীর তাহার একটা হাত কাটিয়া ফেলে। তবুও মুসলমান হইতে অসম্মতি প্রকাশ করিলে, কিছুক্ষণ পরে আর একটা হাত কাটিয়া ফেলে। এইরূপে ক্রমে নাক, কান ও পা কাটে, অবশেষে গলা কাটিয়া তাঁহার প্রাণ বধ করে। যখন হাত-পা-কাটা তিনি পড়িয়াছিলেন, তখন তাঁহার পিপাসায় বুক ফাটিয়া যাইতেছিল। তিনি একটু জল চাহিয়াছিলেন। শত্রুরা জুতার ভিতর প্রস্রাব করিয়া সেই প্রস্রাব তাঁহার মুখে ঢালিয়া দিয়াছিল।

(৪) এই বংশের লোক শ্রীযুক্ত বেচারাম চক্রবর্ত্তী, শ্রীযুক্ত সত্যচরণ চক্রবর্ত্তী ও শ্রীযুক্ত সারদাপ্রসাদ চক্রবর্ত্তী এখনও জীবিত আছেন। তাঁহাদিগের নিকট সেই সময়ের লিখিত একখানি সনন্দ আছে, তাহাতে গবরমেণ্ট এই বংশ-সম্ভূত লোকদিগকে ভাল কর্ম্ম দিতে প্রতিশ্রুত হইয়াছেন।

পশ্চাদ্ধাবিত হয়। কয়েকজন নদী সন্তরণ করিয়া পলায়ন করেন। অবশিষ্ট কয়েকজন বন্দী হন। তিতু তাহাদিগকে গোস্ত খাওযাইযা, কলমা মাথায দিয়া, ত্বকচ্ছেদ করিয়া, মুসলমান করিবার হুকুম দেয়। তাহারা কাতবকণ্ঠে জাতি ভিক্ষা চাহে। তিতু শুনিল না। কয়েকজন নিরীহ নির্দ্দোষ হিন্দু জাতিচ্যুত হইল। হিন্দুর আর নিস্তার নাই।

## তিতুর কেল্লা

তিতু আপনাকে "বাদসাহ" বলিয়া ঘোষণা করিয়াছিল। ইতিপূর্ব্বে নারিকেলবেড়িযা গ্রামে একটী বাঁশের কেল্লাও নির্ম্মিত হইযাছিল। মুসলমান লেখক লিখিয়াছেন,—

"এলাহি ভাবিযা বাঁশের বানাইল কেল্লা।
ঘাস বাঁশ দিযা তবে বানাইল ছেল্লা॥
তাহার ভিতবে জমা সকলে রহিলো।
বেদিন দেখিয়া মোনে সঙ্কট জানিলো।"

কেল্লা বাঁশের হউক,—কেল্লা ভরতপুরের মাটীর কেল্লার মতন সুন্দর, সুগঠিত, সুরক্ষিত, সুসজ্জিত না হউক; কেল্লার রচনা কৌশলময়;—দৃশ্য সৌন্দর্য্যময়। কেল্লার ভিতর যথারীতি অনেক প্রকোষ্ঠ নির্ম্মিত হইয়াছিল। কোন প্রকোষ্ঠে আহাবীয় দ্রব্য স্তরে স্তরে বিন্যস্ত ছিল,—কোন প্রকোষ্ঠে তরবারি, বর্শা, সড়কী, বাঁশের ছোট বড় লাঠি সংগৃহীত সজ্জিত ছিল,—কোন প্রকোষ্ঠে স্তূপাকাবে বেল ও ইষ্টকখণ্ড সংগৃহীত হইয়াছিল। এই কেল্লার কৌশল-কায়দা, তিতুর বুদ্ধি ও শিল্পচাতুর্য্যের পরিচায়ক। এই সময় ফকির যে সব ঐন্দ্রজালিক কাণ্ড দেখাইযাছিল, তাহাতে তিতুমীর ও তাহার অনুচরবর্গের দৃঢ় ধারণা হইয়াছিল, এই কেল্লা বাঁশের হইলেও, প্রস্তরনির্ম্মিত দুর্গ অপেক্ষা দুর্জ্জয় ও দুর্ভেদ্য। এই কেল্লার মধ্যে থাকিয়া যুদ্ধ করিলে, কি ছার বাঙ্গালী জমিদার, দিগ্বিজয়ী ব্রিটিস-রাজকে ফুৎকারে উড়াইয়া দিব। ক্রমে রণসজ্জা ঘনীভূত হইতে লাগিল।

## পঞ্চম পরিচ্ছেদ

### তিতুর অভিষেক

তিতু আপনাকে "বাদসাহ" বলিয়া ঘোষণা করিয়াছিল। যেমন "বাদসাহী", তেমনই কেল্লাও হইয়াছিল; কিন্তু এতদিন বাদসাহীর যথোপযুক্ত অভিষেক হয় নাই। অভিষেকটা আর অবশিষ্ট থাকে কেন? মহাসমারোহে অভিষেক হইল। মইজুদ্দীনের বাড়ীতে বাদসাহ তিতুমীর কিংখাপমণ্ডিত সিংহাসনে অধিবেশন করিল। মইজুদ্দীন উজীর হইল। মইজুদ্দীন রুদ্রপুরবাসী একজন জোলা। মাসুম খাঁ সেনাপতির পদ পাইল। এই মাসুম খাঁ তিতুর ভাগিনেয়। সাজন গাজন ও অন্যান্য কয়েক ব্যক্তি শরীররক্ষক এবং বাকের মণ্ডল জমাদারের পদ গ্রহণ করিল। অতঃপর তিতুমীরের আদেশক্রমে অন্যান্য কর্ম্মচারিবর্গ নিযুক্ত হইল। মুহূর্ত্তে শ্রবণ-ভৈরব গগনবিদারী জয়ধ্বনিতে দিগ্‌দিগন্ত প্রতিধ্বনিত হইয়া উঠিল। তিতুর সমবেত যোদ্ধবেশী শিষ্যমণ্ডলী সমস্বরে একবাক্যে বলিয়া উঠিল,—"জয় বাদসাহ তিতুমীরের জয়।" তিতু রণজয়ী হইয়াছে,—তিতু বাদসাহ হইয়াছে। এইবার তিতু ভারতের একচ্ছত্র রাজা হইবে। তাই তিতু দিগ্বিজয়ে বাহির হইল; ক্রমে ক্রমে অনেক গ্রামবাসী তাহার বশ্যতা স্বীকার করিল। তিতু যুদ্ধোপকরণ ও রসদাদি সংগ্রহে প্রবৃত্ত হইল।

### তিতুর বেগম-বাঞ্ছা

তিতু বাদসাহ হইল, কিন্তু বেগম নহিলে যে বাদসাহী বৃথা। বাদসাহের ইচ্ছা ইঙ্গিতে প্রকাশ পাইল। অমনই চারিদিক হইতে বেগম অন্বেষণার্থ লোক ছুটিল। মোশিয়া গ্রামের জঙ্গালী কামারণী নাম্নী একটী সুন্দরী বিধবা বাদসাহ তিতুমীরের বেগমরূপে নির্ব্বাচিত হইল। তখনই বেগমকে আনিবার জন্য বাদ্যভাণ্ডসহ বহুদলবলে যান প্রেরিত হইল। ব্যাপার দেখিয়া জঙ্গালীর

আত্মীয়েরা আকুল হইয়া উঠিল। তাহারা দেখিল, "আর কুল মান রহে না।" কিন্তু কাহার এমন শক্তি আছে যে, তিতুর কার্য্যে ব্যাঘাত ঘটাইতে পারে? তখন কয়েকজন আত্মীয় গত্যন্তর না দেখিয়া, তিতুর নিকট গিয়া উপস্থিত হইল এবং অবনত-কন্ধরে করযোড়ে কাঁদিতে কাঁদিতে বলিল,—"বাদসাহ! আমরা আপনার অধীন,—আমরা আপনার গোলাম, মারিতে হয়, মারুন,—কাটিতে হয়, কাটুন; জাতি-ইজ্জৎ লইতে হয়, লউন,—রাখিতে হয় রাখুন; তাহার জন্য ভাবনা কি? কিন্তু প্রভু! বে-আদব মাফ্ করবেন,—গোস্তাকি মাফ্ করবেন—আগে কায়েত-বামুনের জাত-ইজ্জৎ লউন, পরে আমরা জাত দেবো।" লোক কয়টীর কথা শুনিয়া তিতুর মতান্তর হইল! তখন তিতু স্পষ্টাক্ষরে বলিল,—"আচ্ছা, এখন বেগমের দরকার নাই; আগে হিঁদুর জাত-ইজ্জৎ নষ্ট করবো; হেঁদুর হাঁড়িতে সুক্তনি এঁদে খাবো, কায়েত বামুনগা ভাল ভাল রাঁড় বেছে বেছে সাদী করবো; তবে জাতির জাত-ইজ্জৎ নষ্ট করবো।"

এই সকল কথা বলিয়া, তিতু জঙ্গালীর আত্মীয়গুলিকে বিদায় দেয়।

### তিতুর পুনর্জ্জয়

অতঃপর হিন্দুদিগের উপর তিতুর অত্যাচার বৃদ্ধি হইতে লাগিল। তিতু রণজয়ে গর্ব্বিত হইয়া উদ্দাম-উদ্‌ভ্রান্ত চিত্তে আজ এ গ্রাম, কাল ও গ্রাম, এইরূপে গ্রাম লুঠিতে লাগিল। এইরূপে অত্যাচারিত হইয়া সাতক্ষীরা, গোবরডাঙ্গা প্রভৃতি স্থানের বিখ্যাত জমিদারেরা একজোট হইলেন এবং পরে নদীয়ার কলেক্টরকে দরখাস্ত করিলেন। ইতিপূর্ব্বে তিতুর অত্যাচার ও আলেকজেন্দার সাহেবের পরাজয়ের কথা কলিকাতার তদানীন্তন গবরণর-জেনারেল বেন্টিঙ্ক সাহেবের কর্ণগোচর হইয়াছিল। গবরণর সাহেবের আদেশ পাইয়া নদীয়ার কলেক্টর ও জজ সাহেব কয়েকটা হস্তী ও অনেকগুলি লোকজন লইয়া স্থলপথে হস্তীর উপরে এবং জলপথে বজরা

যোগে নারিকেলবেড়িয়ায় যাত্রা করেন। অনেকে বলেন, কলেক্টর সাহেব বজরাযোগে জলপথে এবং জজ সাহেব হস্তীতে আরোহণ করিয়া স্থলপথে গিয়াছিলেন। ইছামতী নদী দিয়া বজরা গিয়াছিল। সাহেবেরা আসিযাছে, তিতুর সেনাপতি মাসুম ইতিপূর্ব্বে সে সন্ধান পাইয়াছিল। সেও আপনার সৈন্য লইয়া বারঘরিয়ায় গিয়া তথাকার কুঠীতে অবস্থিতি করে। মাসুম গিয়াছে, শুনিয়া কলেক্টর আপনার সেনাদিগকে হুকুম দিলেন,—"এখুনই মাসুমকে আক্রমণ কর। কলেক্টরের সৈন্য অগ্রসর হইতে লাগিল। মাসুমের লোকেরা তখনই কুঠী হইতে তাহাদের উপর ইট ছুড়িতে লাগিল। মাসুমের পক্ষ হইতে ইট খাইয়া কলেক্টরের অনেক লোক ভূতলশায়ী হইয়াছিল। মাসুমের লোকেরা যেমন আক্রমণ করিতে থাকিল, অমনই কলেক্টর সাহেবের লোকেরা গুলি ছুড়িতে আরম্ভ করে। মাসুমের পক্ষে কয়েকজন হত হইল। কলেক্টরের পক্ষে কিন্তু অনেক ক্ষতি হইয়াছিল। অনেককে হতাহত হইতে দেখিয়া কলেক্টর সাহেব যুদ্ধ স্থগিত রাখিবার হুকুম দিলেন। সাহেবের হুকুমে যুদ্ধ স্থগিত হইল। অমনই মাসুমের লোকেরা সাহেবের লোকদিগকে আক্রমণ করিল। সাহেবের অনেক লোক নিহত হইল। মাসুম্ একটী হস্তী ও কয়েকটা বন্দুক কাড়িয়া লইল। সাহেব বজরায় আশ্রয় লইলেন। জজ সাহেব যুদ্ধ করেন নাই। তিনি কলেক্টর সাহেবকে বজরায় যাইতে দেখিয়া তাঁহার অনুসরণ করিয়াছিলেন। মাসুমের লোকেরা রাত্রিকালে বজরার দড়ি কাটিয়া দিয়াছিল। সাহেবরা বজরা করিয়া ভাসিয়া চলিয়া যান।

## তিতুর আস্ফালন

এই সংঘর্ষণে পুঁড়ার কৃষ্ণদেব, সাহেবদের সঙ্গে ছিলেন। কৃষ্ণদেব ভাবিয়াছিলেন,—"এইবার তিতুর লীলা-খেলা ফুরাইবে, এইবার তিতু সদলবলে নিহত হইবে।" ফলে কিন্তু বিপরীত হইল। সাহেবেরা পরাজিত হইয়া বজরায় আশ্রয় লইলেন। কৃষ্ণদেব

নিরাশ্রয় নিঃসহায় হইলেন। কৃষ্ণদেব দেখিলেন,—চারিদিকে তিতুর লোক জয়োল্লাসে উন্মত্ত হইয়া উঠিয়াছে, একবার দেখিতে পাইলে খণ্ড খণ্ড করিয়া কাটিয়া ফেলিবে। কৃষ্ণদেব ভাবিলেন,—"এইবার আমার শেষ। এখানে আমার এমন একটী লোক নাই যে, আমাকে এ বিপদে দুটো সান্ত্বনার কথা কহে। আজ তিতুর মনোরথ পূর্ণ হইবে। আজ তিতু আমাকে বিনাশ করিয়া বৈর-নির্যাতনের নিবৃত্তি করিবে। এখন আর উপায় কি? মৃত্যু অনিবার্য্য। ব্রাহ্মণ-সন্তানকে আজ যবন হস্তে প্রাণ বিসর্জ্জন করিতে হইবে। হা ভগবন্! জমিদার ব্রাহ্মণ-সন্তানের এই পরিণাম হইল!" এইরূপ ভাবিতে ভাবিতে কৃষ্ণদেব দরবিগলিত ধারে অশ্রু বিসর্জ্জন করিতে লাগিলেন। সে সময় কৃষ্ণদেবের মনে স্ত্রী-পুত্র-পরিবারের কথা উদিত হয় নাই কি, কিন্তু উপায় কি? কৃষ্ণদেব তখন নিরুপায় হইয়া, একান্তমনে ভবভয়হারী শ্রীমধুসূদনের নাম জপ করিতে লাগিলেন। জয়োল্লাসে উন্মত্ত তিতুর লোকেরা তাঁহাকে আদৌ দেখিতে পায় নাই। একান্তে নাম-সাধনার ইহা একটা প্রত্যক্ষ ফল। কৃষ্ণদেব হরিনাম জপ করিতে করিতে তিতু-সৈন্যের চক্ষুর অন্তরাল হইবার সঙ্কল্পে একটু একটু পশ্চাৎপদ হইতে লাগিলেন। সহসা তিতুর লোকমণ্ডলী হইতে একজন তীব্রবেগে ছুটিয়া আসিয়া তাঁহার সম্মুখবর্ত্তী হইল। সহসা তিতুর সম্পর্কীয় লোককে দেখিয়া, কৃষ্ণদেব ভয়-বিহ্বলচিত্তে কাষ্ঠ-পুত্তলীবৎ দাঁড়াইয়া রহিলেন। উপস্থিত লোকটী অনুচ্চ স্বরে দ্রুত কথায় বলিল,—"আমি জীবিত থাকিতে আপনার কোনও ভয় নাই; আপনি পলায়ন করুন। মাসুম্ দেখিতে পাইলে, এখনই আপনাকে মারিয়া ফেলিবে।" কৃষ্ণদেব স্তম্ভিত হইলেন, অথচ এ বিপদ বহ্নির মধ্যে এ স্বপ্নাতীত সান্ত্বনার সুধা-সেবনে একটু স্নিগ্ধও হইলেন। তিনি ভয়-বিস্ময়ের আবেশে আগন্তুকের আপাদ-মস্তক অবলোকন করিলেন। তখন আগন্তুক বলিল,—"প্রভু, আপনি আমাকে চিনিতে পারিতেছেন না। আমার নাম মতি-উল্লা। পূর্ব্বে

এ গোলাম আপনারই ছিল।” এই কথা শুনিবামাত্র কৃষ্ণদেব বুঝিতে পারিলেন, এই মতি-উল্লা পূর্ব্বে তাঁহার একজন বিশ্বস্ত অনুগত ভৃত্য ছিল। মতি-উল্লা আর কালবিলম্ব না করিয়া বলিল, “হুজুর! আর বিলম্ব করিবেন না; এখনই পলাইয়া যান।” কৃষ্ণদেব কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় হইলেন। তখন মতি-উল্লা আর কোনও উপায় না দেখিয়া, সজোরে কৃষ্ণদেবকে আকর্ষণপূর্ব্বক স্কন্ধে উঠাইয়া লইল এবং মুহূর্ত্তমধ্যে ইছামতী নদীতে ঝাঁপ দিল। ঝাঁপ দিয়াই মতি-উল্লা কৃষ্ণদেব সহ সাঁতরাইয়া নদীর পরপারে উপস্থিত হইল। এইবার মতি-উল্লা বলিল,—“আপনি পলায়ন করুন; আমি চলিলাম।” এই কথা বলিয়াই মতি-উল্লা আবার ইছামতী নদীতে পড়িয়া সাঁতরাইয়া আসিয়া আপন দলে উপস্থিত হইল। অতঃপর কৃষ্ণদেব দ্রুতপদে পলায়ন করিয়া আপনার জীবন রক্ষা করেন। কৃষ্ণদেব কিন্তু জীবনে সেই পূর্ব্বান্নভুক্ কিঙ্করের সে উপকার বিস্মৃত হন নাই। বিদ্রোহাবসানে কৃষ্ণদেব মতি-উল্লাকে যথোপযুক্ত পুরস্কার দিয়াছিলেন এবং তাহার বসৎবাটী নিষ্কর করিয়া দিয়াছিলেন।

## তিতুর ঘোষণা

তিতু দুই তিনটী যুদ্ধে জয়লাভ করিয়া আবার দূতমুখে চারিদিকে ঘোষণা করিলেন,—“আমি বাদসাহ।” এখন হইতে তিতু নিত্য বাদসাহীর বিভূতি বিকাশ জন্য আপনি কিংখাপমণ্ডিত মসনন্দী গদিতে এবং মন্ত্রিগণ তাঁহার চতুর্দ্দিকে ভিন্ন ভিন্ন আসনে উপবেশন করিত। তিতু সভায় বসিলে, বন্দীরা তাল-লয়-মানে স্তুতি-গান করিত এবং ডগডগ শব্দে নহবৎ বাজিয়া উঠিত। উঠিবার সময়ও এই ব্যবস্থা। অনেক গ্রামের অনেক সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি তিতুর বশ্যতা স্বীকার করিয়াছিলেন। তাঁহাদের অনেকেই তিতুর বাদসাহী সভায় উপস্থিত থাকিয়া আপনাদের বশ্যতা-ব্যাপকতা বিজ্ঞাপিত করিতেন। কেবল বশ্যতা নহে, কেহ কেহ নাকি তিতুর দলভুক্তও হইয়াছিলেন। শুনিতে পাই, ভূষণার অপ্রাপ্তবয়স্ক জমিদার

মনোহর রায় তিতুর দলভুক্ত হইয়াছিলেন। মনোহর রায় শক্তি সামর্থ্যে এবং অর্থসাহায্যে তিতুর অনেক উপকার করিয়াছিলেন। তিতুর সর্ব্বার্থ-সহায় ফকির, মনোহর রায়কে বড় ভালবাসিত। এই ফকির যখন তখন তিতুর বাদসাহী সভায় উপস্থিত হইয়া তিতুকে তাম্রকুণ্ডের জলে অভিষেক করিত এবং আশীর্ব্বাদ করিয়া বলিত,— "তিতু! তুমিই বাদসাহ। ইংরেজ ফিরিঙ্গিদের দূরীভূত করিয়া দাও।"[৮]

## তিতুর পত্র

অতঃপর তিতু রসদ-সংগ্রহার্থ বড় বড় জমিদারদিগকে পত্র লিখিতে আরম্ভ করিল। গোকনা গ্রামের জমিদার রামনিধি হালদার মহাশয় তিতুর নিকট হইতে নিম্নলিখিত পত্র পাইয়াছিলেন,—

"হালদার! কাল তোমার বাড়ীতে তোমার সহিত সাক্ষাৎ করিব। আমি দলবলে যাইব; আমাদের জলযোগের জন্য এক বিশ চাউল, পঞ্চাশটী মোরগ, পঁচিশটী খাসি এবং গোটা বারো ষাঁড় যোগাড় করিয়া রাখিবে।"

শ্রীতিতুমীর বাদসাহ।

পত্র পাইয়া, হালদার মহাশয় চকিত, স্তম্ভিত ও ভীত হইলেন। তিতুর নামমাত্রে তখন লোকে থরহরি কম্পান্বিত হইত। এ যে সাক্ষাৎ সম্বন্ধে আদেশপত্র! আর কি রক্ষা আছে। ত্রুটি হইলে তিতু কি কাহাকেও রাখিবে? ক্রমে এ চিঠির কথা গ্রামে রাষ্ট্র হইল। গ্রামের লোকে অনেকে ভয়ে পলাইল। রামনিধি হালদার মহাশয়ের পরিবার স্থানান্তরে পলায়ন করিলেন। রামনিধি

৮ কেহ কেহ বলেন,—"তিতু আপনাকে বাদসাহ বলিয়া ঘোষণা করিলে পর, হঠাৎ একদিন এই ফকির আসিয়া তিতুকে আশীর্ব্বাদ করিয়াছিলেন। ইনি মক্কা হইতে "জম্-জম্" জল আনিয়া, তাহাতে তিতুকে অভিষিক্ত করিয়াছিলেন। ইহার পর তিনি অন্তর্হিত হন। পূর্ব্বে তিতুর কাছে আর কোনও ফকির ছিল না।"

হালদারের পৌত্র মধুসূদন হালদার বাতরোগে অকর্ম্মণ্য হইয়া পড়িয়াছিলেন। তিনি ডুলি করিয়া পলাইতেছিলেন। পথে তিতুর লোকেরা তাঁহাকে ধরিয়া অপমান করিবার উদ্যোগ করে। তিতুর জমাদার বাঁকের মণ্ডল না থাকিলে, হয় ত, এ যাত্রা তাহার নিস্তার পাওয়া দায় হইত। বাঁকের মণ্ডল পূর্ব্বে হালদার মহাশয়দের বাড়ীতে চাকুরী করিত। এক্ষণে পূর্ব্ব-প্রভুকে বিপদ্‌গ্রস্ত দেখিয়া, সে কাতর-কণ্ঠে তিতুর সেনাপতি মাসুমের নিকট মধুসূদনের মুক্তি ভিক্ষা করিল। বাঁকের মণ্ডলের অনেক অনুরোধে মাসুম্ মধুসূদনকে অব্যাহতি দেয়। মধুসূদন অব্যাহতি পাইয়া বাঁকেরকে আশীর্ব্বাদ করিতে করিতে নিজ স্থানে প্রস্থান করেন।

## তিতুর সঙ্কট-সঙ্কেত

যেদিন হালদার মহাশয়ের সহিত তিতুর সাক্ষাৎ করিবার কথা ছিল, তাহার পূর্ব্বদিন তাঁহারা বড় উদ্বিগ্ন হইয়া রাত্রিযাপন করিয়াছিলেন। রাত্রি দুই প্রহরের সময় তাঁহারা অকস্মাৎ মেটিয়ার গ্রামের দিকে একটা ভয়ঙ্কর কোলাহল শুনিতে পাইলেন। কিসের এ কোলাহল ? তিতু বুঝি সদলবলে আসিতেছে ? তিতু আসিল না, তবে এ কিসের কোলাহল ! সে রাত্রি কিছুই নিরূপিত হইল না। পরদিন প্রাতঃকালে কোলাহলের কারণ নির্ণয়ার্থ তিনটী ভদ্রলোক প্রেরিত হইয়াছিলেন। প্রেরিত লোকেরা গিয়া যাহা দেখিলেন, তাহাতেই তাঁহাদের সর্ব্বশরীর শিহরিয়া উঠিল, পরন্তু একটু পুলকোদ্গমও হইল। তাঁহারা দেখিলেন, "গ্রামের প্রান্ত-সীমায় এক বিস্তৃত শিবির সন্নিবেশিত। শিবির-সম্মুখে একজন ইংরেজ সৈনিক পুরুষ। তাঁহার পরিধান, লাল কোর্ট-পেণ্ট্‌লেন, মস্তকে টুপি, কটিদেশে চর্ম্মাবরণে নিবদ্ধ অসি। তাঁহার সম্মুখে অনেকগুলি কুলী উপস্থিত। তাঁহারা আরও দেখিলেন, অনেকগুলি সিপাহী ও গোরা যম-কিঙ্করবৎ শ্রেণীবদ্ধ হইয়া শিবির সম্মুখে অবস্থিতি করিতেছে।

পাঠক বুঝিলেন, ইহারা কাহারা ? ইতিপূর্ব্বে আলেকজেন্দার

সাহেবের মুখে তাঁহার পরাভব এবং তিতুর অত্যাচারের কথা আদ্যোপান্ত শ্রবণ করিয়া, কলিকাতার তাৎকালিক গবরণর জেনারেল লর্ড বেণ্টিঙ্ক দুইটী কামান, একশত গোরা এবং তিনশত সিপাহী সহ কর্ণেল সাহেবকে পাঠাইয়া দিয়াছিলেন। যে সাহেবের সম্মুখে কুলীরা উপস্থিত ছিল, তিনিই স্বয়ং কর্ণেল। কামান লইয়া যাইবার পথ পরিষ্কার করিবার জন্য কর্ণেল সাহেব কুলীদিগকে উপদেশ দিতেছিলেন। হঠাৎ হালদারগণ প্রেরিত তিনটি লোকের উপর কর্ণেল সাহেবের দৃষ্টি পতিত হইল। তিনি ইঙ্গিত করিয়া, তাঁহাদের ডাকিলেন। তাঁহাদের মধ্যে শ্রীরামচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় নামক এক ব্যক্তি অগ্রসর হইয়া সাহেবের নিকট গমন করিলেন। ইনি তিন জনের মধ্যে সাহসী ছিলেন এবং ইংরেজি জানিতেন।

বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় সাহেবের নিকট উপস্থিত হইলে, সাহেব তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন,—"আপনি কে?"

বন্দ্যো। আমি হিন্দু-ব্রাহ্মণ,—নিবাস গোকনায়।

সাহেব। আপনি এখানে আসিয়াছেন কেন?

বন্দ্যো। গত কল্য রাত্রিতে একটা কোলাহল শুনিয়াছিলাম। কিসের কোলাহল, তাই জানিতে আসিয়াছি।

সাহেব। আপনি তিতুমীরকে জানেন?

বন্দ্যো। আজ্ঞে জানি।

সাহেব। তিতু এখন কোথায়?

বন্দ্যো। নারিকেলবেড় গ্রামে।

সাহেব। আপনি তিতুকে চেনেন?

বন্দ্যো। আজ্ঞে, তিতুকে আর চিনি না! তিতুকে কে না চেনে? সে আমাদের সর্ব্বনাশ করিতেছে। তাহার অত্যাচারে বাস করা দায়।

সাহেব। আমরা তিতুকে শাসন করিবার জন্য আসিয়াছি।

এই কথা বলিয়া কর্ণেল সাহেব বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়কে বলিলেন, আপনি আপনার সঙ্গী দুটী লোককে বিদায় দিয়া আমার সঙ্গে থাকুন। আমাকে নারিকেলবেড় গ্রামে লইয়া চলুন।

বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় স্বীকার পাইলেন। তাঁহার সঙ্গী দুইজন বিদায় লইয়া গোকনায় ফিরিয়া গেলেন।

### তিতুর সঙ্কট-সঙ্কেত (২)

অতঃপর কর্ণেল সাহেব সসৈন্যে নারিকেলবেড়িয়া গ্রামের অভিমুখে যাত্রা করেন। বেলা দুই প্রহরের সময় তিনি বাদুড়িয়া-গঞ্জে উপস্থিত হইয়া সৈন্যদিগকে আহার করিয়া লইতে বলেন। সৈন্যগণ তাঁহার আদেশে আহার প্রস্তুত করিবার উদ্যোগ করিল। এই সময় তিতুমীরের তথ্য লইবার জন্য কর্ণেল সাহেব দুইজন অশ্বারোহীকে নারিকেলবেড়িয়া গ্রামে প্রেরণ করেন। অশ্বারোহী দুইজন দ্রুতবেগে নারিকেলবেড়িয়া গ্রামে উপস্থিত হন। তিতুর লোকেরা দুইজন অপরিচিত সুসজ্জিত অশ্বারোহী সৈন্য দেখিয়া, "আল্লা হো, আল্লা হো" শব্দে চীৎকার করিয়া উঠিল। বাদসাহ তিতুমীরের কাছে সংবাদ গেল। তিতুমীর হুকুম দিলেন,—"কাফের দুইজনকে কাটিয়া ফেল।" তিতুর হুকুম হইবামাত্র সেনাপতি মাসুম্ অশ্বারোহী দুইটাকে তাড়া করিল। অশ্বারোহী দুইটী যুদ্ধ করিবার ত আদেশ পায় নাই। কাজেই, তাহারা বেগতিক দেখিয়া বাদুড়িয়ার দিকে ছুটিয়া গেল। ছুটিতে ছুটিতে একটী অশ্বারোহীর অশ্ব ছুটিয়া এক বটবৃক্ষতলে উপস্থিত হইল। অশ্বারোহী তাহাকে ফিরাইয়া সোজা পথে লইবার জন্য রাস টানিল। অশ্ব রাস মানিল না; পরন্তু অগ্রসর হইতে লাগিল। অগ্রসর হইতে হইতে বট গাছের একটা শাখায় আটকাইয়া অশ্বারোহী ভূতলে নিপতিত হইল। সেই সময় মাসুম্ বিদ্যুদ্বেগে ছুটিয়া গিয়া অশ্বারোহীকে দ্বিখণ্ড করিয়া কাটিয়া ফেলিল। অপর অশ্বারোহী আর বিলম্ব না করিয়া দ্রুতবেগে বাদুড়িয়ায় উপস্থিত হইল। কর্ণেল সাহেব

তাহার মুখ হইতে আদ্যোপান্ত সকল বিষয় অবগত হইলেন। তখনও সেনাসমূহের আহারাদি হয় নাই। কর্ণেল সাহেব বলিলেন, "আহার করিয়া কাজ নাই,—এখনই চলো।" কর্ণেল সাহেবের কথা শুনিবামাত্র সেনাসমূহ আহার পরিত্যাগ করিয়া যুদ্ধযাত্রা করিল।

সন্ধ্যার সময় ইংরেজ সৈন্য নারিকেলবেড়িয়া গ্রামে উপস্থিত হইল। কর্ণেল সাহেব হুকুম করিলেন,—"গ্রাম ঘেরোয়া কর।" সেনারা গ্রাম ঘেরিয়া ফেলিল। সকলেই অসি উন্মুক্ত করিয়া বীরদর্পে সুসজ্জিত ভাবে প্রশান্ত-গম্ভীর মূর্ত্তিতে দণ্ডায়মান রহিল। তিতুর যে সব লোক ইতিপূর্ব্বে অগ্রসর হইয়াছিল এবং যাহারা ইংরেজ সৈন্য দেখিয়া ভয়ে পলাইবার চেষ্টা করিয়াছিল, ইংরেজ সৈন্যের অব্যর্থ অসির আঘাতে তাহাদের অনেকেই নিহত হইল।

তিতু সংবাদ পাইল, ইংরেজ সৈন্য উপস্থিত হইয়াছে। তিতু ভীত হইল; কিন্তু বাহিরে কিঞ্চিন্মাত্র ভয়ের ভাব প্রকাশ না করিয়া সকলকে বলিল,—"ভয় কি ? যুদ্ধ করিতে হইবে।" নিকটে একটী লক্ষ-ইটের পাঁজা ছিল। তিতু বলিল,—"এই ইট্ খণ্ড খণ্ড কর এবং যেখানে যত বেলগাছ আছে, তাহা হইতে বেল পাড়িয়া লইয়া এসো। পরে এই ইট্ ও বেল কেল্লার মধ্যে জমা করিয়া রাখো।" তিতুর আজ্ঞা প্রতিপালিত হইল। অতঃপর তিতু উৎসাহ-বাক্যে আপন লোকদিগকে উত্তেজিত করিয়া তুলিল। তিতুর লোকেরা উত্তেজিত হইয়া, "আল্লা হো" "আল্লা হো" শব্দে,—"জয় তিতুমীরের জয়" নিনাদে স্থাবর-জঙ্গম কাঁপাইয়া তুলিল। নির্ভীক সাহসী নিত্য-বলদৃপ্ত সুশিক্ষিত ইংরেজ সেনা যুদ্ধার্থ প্রস্তুত হইল। কেবল কর্ণেলের অনুমতির অপেক্ষামাত্র। কর্ণেল সাহেব জলদগম্ভীর ভীমনাদে বলিলেন,—"অদ্য রাত্রিতে যুদ্ধ করিবার প্রয়োজন নাই; সকলে স্থির হইয়া থাকো।" কর্ণেল সাহেবের আদেশক্রমে ইংরেজ সৈন্য যুদ্ধ করিল না। রাত্রিকালে কিন্তু বিদ্রোহীরা ইংরেজসেনার

প্রতি ইষ্টক নিক্ষেপ করিয়াছিল। দুই চারিজন ইংরেজ সেনা আহত হইয়াছিল।

## তিতুর শেষ

নিশাবসানে ইংরেজ সৈন্য যুদ্ধার্থ প্রস্তুত হইল। ১৮৩১ খ্রীষ্টাব্দের ১৪ই নবেম্বর। অদ্য তিতুর শেষ দিন। প্রভাতী অনিল বালার্কের লোহিতরাগরঞ্জিত রেণু-কণা সহ মিশিয়া ইছামতীর স্রোতপ্রবাহে গড়াইতে গড়াইতে যেন তিতুর শেষাভিনয় ঘোষণা করিয়া বেড়াইল। ইংরেজ সৈন্যের আজ বিশ্ববিজয়িনী সংহার-মূর্ত্তি! তাহাদের উন্মুক্ত অসি প্রভাত-সূর্য্যের ঝলমল কিরণে ঝলসিত হইল! ইংরেজ সৈন্যের সেই সংহার-মূর্ত্তি দেখিয়া তিতুর লোকেরা ভয় পাইল। তিতু কিন্তু অচল অটল। তিতু বুঝি ভাবিল, "ভাগ্যে যাহা হয় হইবে, যুদ্ধে প্রাণ দিব।" এদিকে ইংরেজ সৈন্য যুদ্ধার্থ অনুমতি প্রার্থনা করিল। কর্ণেল সাহেব সকলকে নিরস্ত করিয়া আপনি অশ্বারোহণপূর্ব্বক ধীরে ধীরে তিতুর বংশনির্ম্মিত কেল্লার দিকে অগ্রসর হইলেন। কেল্লার প্রধান ফটকের সম্মুখস্থ হইয়া, তিনি একখানি গ্রেপ্তারী পরোয়ানা বাহির করিলেন এবং তাহা তরবারির অগ্রভাগে বিদ্ধ করিয়া উচ্চনাদে বলিলেন,—"মহাশয়! ভারতবাসীর মহামান্য গবরনর জেনারেল আপনাকে সদলবলে গ্রেপ্তার করিবার জন্য পরোয়ানা দিয়াছেন। আপনি স্বেচ্ছায় গ্রেপ্তার হইবেন কি না, জানিতে চাহি।" উন্মত্ত তিতু গ্রেপ্তারের কথা বুঝিল না বা মানিল না। উন্মত্ত তিতু, আত্মহারা তিতু, নির্ব্বোধ তিতু, অজ্ঞান তিতু কোপকষায়িত লোচনে বীরগর্ব্বিত বচনে বলিল,—"মারো, মারো, কাটো, কাটো সাহেবকে।" তিতুর কথায় তিতুর লোকেরা সাহেবকে আক্রমণ করিবার উদ্যোগ করিল। সাহেব নির্ভীক চিত্তে আবার দুইবার গ্রেপ্তারীর কথা বলিলেন। ফল হইল না। তখন সাহেব আপনার সৈন্যগণের নিকট ফিরিয়া গিয়া সকলকে যুদ্ধ করিতে আদেশ করিলেন।

যুদ্ধের আদেশ পাইবামাত্র যুদ্ধকামোন্মত্ত ইংরেজ সৈন্য হুঙ্কার

করিতে করিতে তিতুমীরের কেল্লার অভিমুখে অগ্রসর হইল। পদাতি তরবারি খুলিল, অশ্বারোহী সবেগে ছুটিল, তালে তালে রণমদে রণবাদ্য বাজিয়া উঠিল, উত্তেজনার কলকল কোলাহলে দিগ্‌দিগন্ত উদ্বেলিত হইল। দেখিতে দেখিতে ইংরেজ সৈন্য তিতুমীরের কেল্লা ঘেরিয়া ফেলিল। কর্ণেল সাহেব কামান দুইটীকে কেল্লার সম্মুখভাগে স্থাপন করিলেন। তিতুমীর ঠিক কামানের মুখের উপর ছিল। কামানের ভীম মূর্ত্তি অবলোকন করিয়া তিতুর লোকেরা একটু সরিয়া গেল। -

কিন্তু একি এ! অকস্মাৎ এ আবার কি মূর্ত্তি! এ আবার কি বেশ! আজ তিতুর এ দীনহীন পথের ভিখারিবেশ কেন? কোথায় সেই স্বপ্নৈশ্বর্য্য বাদশাহী বেশ! কোথায় সে বাদশাহী বিভূতি দোর্দ্দণ্ড রাজদণ্ড! রাজদণ্ডের পরিবর্ত্তে এখন দক্ষিণ হস্তে একগাছি তজমীর মালা এবং অন্য হস্তে আশা। একি এ! সে গৌরাঙ্গ উজ্জ্বল-কান্তি তিতুর বদনমণ্ডলে আজ কারুণ্যের হিমানী-ধারা কেন? বীর্য্যবান্ তিতু ভক্তের ভক্তি-চুম্বক হীন ফকিরের বেশ ধারণ করিয়াছে! বংশ-দুর্গের দ্বারদেশে তিতু ধ্যানমগ্ন! শিষ্যমণ্ডলী সে ধ্যানমগ্ন মধুর ফকির-মূর্ত্তি একাগ্র-নয়নে নিরীক্ষণ করিতে করিতে ভক্তির ক্ষীরধারে আপ্লুত হইতেছে। যেন ভক্তবৎসলের মোহকর রূপে বিমোহিত হইয়া নিস্পন্দ নিস্তব্ধভাবে চিত্রার্পিত মূর্ত্তিবৎ দণ্ডায়মান রহিয়াছে।

তাহারা বাহ্য বিভীষিকা বিস্মৃত হইয়া ভক্তিগদগদ-চিত্তে যেন তিতুর মুখ-কমলের অনাবিল মকরন্দ পান করিতেছে। তখন যেন তাহারা মনে করিল,—কি তুচ্ছ সাম্রাজ্য-রাজ্য, কি তুচ্ছ ধন-সম্পদ, কি তুচ্ছ স্ত্রী-পুত্র, কি তুচ্ছ আত্মীয়স্বজন? ধ্যানান্তে তিতু উচ্চকণ্ঠে ভগবানের নামোচ্চারণ করিল। কিয়ৎক্ষণ পরে তিতু সকলকে সম্বোধন করিয়া কহিল,—"দেখ ভাই সকল, তোমরাই আমার অবলম্বন। তোমাদের আশা-ভরসায় আমি অকূল সাগরে ঝাঁপ দিয়াছি। তোমরা যদি প্রাণপণে সাহায্য কর, তাহা হইলে আমি

রাজ্যরক্ষা করিতে পারি; নহিলে আমাকে পথের ভিখারী হইতে হইবে। যদি সমস্ত দেশ জয় করিতে পারি, যদি ফিরিঙ্গি ইংরেজকে তাড়াইতে পারি, তাহা হইলে তোমাদিগকে পুরস্কার দিব। ভয় পাইও না। যখন মরিতেই হইবে, তখন যুদ্ধে মরিবার জন্য ভয় কেন? কোরাণে লিখিত আছে, যুদ্ধে মরিলে মানুষ 'ভেস্তে' যায়। তবে কেন ভাই, কাপুরুষের মতন মরিব। কেন নরকে যাইব। ধর্ম্মের জন্য মরিলে, স্বর্গের কজ্জল-নয়না অপ্সরাদিগের অনুপম সৌন্দর্য্যসুখানুভব করিব। কেমন ভাই, তোমরা বীরের ন্যায় প্রাণ দিতে পারিবে?''

তীব্র সুরাসার ভেষজে যেমন অবসন্ন মুমূর্ষুর তর্জ্জনীবেগ তর তর নাচিয়া উঠে, তিতুর উৎসাহবাণীতে অবসন্ন তিতুশিষ্যেরা সেইরূপ মুহূর্ত্তে মাতিয়া উঠিল। তিতুর কথা শুনিবামাত্র সকলেই সমস্বরে বলিল, "পারিব", "পারিব"।

এই সময় ফকির মিস্কিন্ উপস্থিত হইয়া সকলকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন,—"তোমাদের ভয় নাই,—আমি থাকিতে তোমাদের ভয় নাই। আমি সিপাহীদের কামান, বন্দুক, তরবারি সব ভারিয়া ফেলিয়াছি। সে কামান বন্দুক হইতে গোলাগুলি বাহির হইবে না। কেহ তরবারি তুলিতে পারিবে না। তোমরা কেহ মরিবে না, ভয় নাই। মরিলে আমি বাঁচাইব। আমার কথা বিশ্বাস করিয়া যুদ্ধ কর।''

ফকিরের কথায় উপস্থিত তিতু শিষ্যগণ উত্তেজিত হইয়া, "আল্লা হো," "আল্লা হো" শব্দে দিগন্ত ব্যাপিয়া আপনাদের যুদ্ধকর্ত্তব্যতা বিজ্ঞাপিত করিল। এই সময় ফকির আবার জলদনিঃস্বনে বলিতে লাগিলেন,—"শুন ভাই! আমার কথা শুন, যুদ্ধ কর, ভয়ে পলাইও না, যে-পলাইবে—" এই কথা বলিতে বলিতে সহসা গম্ভীর মেঘগর্জ্জনবৎ গুডুম শব্দে দিক্ আলোড়িত হইল। দেখিতে দেখিতে মুহূর্ত্তে তিতুর বাঁশের দুর্গ কাঁপিয়া উঠিল। আকাশ-পৃথ্বী ঘোর ঘন ধূমাবর্ত্তে আচ্ছন্ন হইল। সে সূচিভেদ্য অন্ধকারে আর

দৃষ্টি চলে না। তিতু শিহরিয়া উঠিল, ফকির বিষণ্ণ হইল, মাসুম টলিয়া পড়িল, মইজুদ্দীন কাঁদিয়া ফেলিল, সাজন গাজন পলাইবার পথ দেখিল। সে পলাইয়া নিকটস্থ একটী বৃক্ষের আড়ালে লুকাইয়া রহিল।

যে শব্দে তিতুর কেল্লায় বিভীষিকার এই করুণ দৃশ্য, ইংরেজের কামান হইতে সেই শব্দ উত্থিত হইয়াছিল। কর্ণেল সাহেব করুণার বশে তিতুকে কেবল ভয় দেখাইবার সংকল্পে একটি ফাঁকা আওয়াজ করিয়াছিলেন। ফাঁকা আওয়াজের ফাঁকা ধূমমাত্র উদ্গীরিত হইয়াছিল। ফাঁকা ধূম প্রকৃতির ফাঁকায় মিশিয়া গেল। আবার দিঙ্‌নিচয় রবিকরোদ্ভাসে পূর্ব্ববৎ প্রসন্ন প্রফুল্ল হইল। কামানে গোলা ছিল না; সুতরাং তিতু সদলবলে অক্ষত রহিল। ফকির তখন গর্ব্বোন্মাদে বিকট হাসি হাসিয়া গর্ব্বিত বাক্যে বলিল,—"গোলা খা ডালা।"[৯] তিতুর অনুচরবর্গ বুঝিল, নিত্য ঋতবাদী ফকির সত্য সত্যই গোলা গিলিয়া ফেলিয়াছে। তখন তাহারা ফকিরের অলৌকিক-কীর্ত্তির আলোচনা করিতে করিতে মরণের ভীতি-শূন্য হইয়া প্রবলবেগে ইংরেজ সৈন্যদিগকে আক্রমণ করিল। আবার তাহারা ইংরেজ সৈন্যের প্রতি ইষ্টক ও বেল নিক্ষেপ করিতে লাগিল। এই সময় ফকির বলিল,—"তোমরা ভয় পাইও না; যুদ্ধ কর; তোমাদের জয় হইবে; আমি মক্কা হইতে সেনা আনিতে চলিলাম; মক্কা হইতে যতদিন না ফিরি, ততদিন যুদ্ধে ক্ষান্ত হইও না।" এই বলিয়া ফকির অন্তর্দ্ধান হইল। ইহার পর ফকিরের আর কোন সন্ধান পাওয়া যায় নাই।[১০]

৯ "গোলা খা লিয়া" ইহাই প্রকৃত কথা; কিন্তু এ পর্য্যন্ত "গোলা খা ডালা" এই কথাই চলিয়া আসিতেছে।

১০ এই ফকির সম্বন্ধে নানা লোকে নানা কথা বলেন। কেহ বলেন, তিনি মস্তেন সাহা, কেহ বলেন, বড়িসা; কেহ বলেন, ঠাকুর সাহেব। কাহারও বিশ্বাস, তিনি সিদ্ধপুরুষ পীর। কোথাও বা এইরূপ জনশ্রুতি আছে, মুসলমানদিগকে অত্যাচারী হইতে দেখিয়া, তাহাদের ধ্বংসসাধনার্থ তিনি তিতুমীরের দলে যোগ দেন এবং ইংরেজের বিরুদ্ধে তিতুমীরকে উত্তেজিত করেন।

কর্ণেল দেখিলেন, তিতুর চৈতন্য হইল না; তিতু সত্য সত্যই দিশেহারা,—আত্মহারা; তাই জ্বলন্ত অনলে ঝাঁপ দিয়া মরিতে উদ্যত হইতেছে। কিন্তু আর ক্ষমা করিলে ত চলিতেছে না। কাজেই তিনি কামানে গোলা পুরিলেন। এদিকে ভীষণ যুদ্ধ চলিতেছিল। তিতুর অনুচরবর্গের লাঠি-সড়কীতে অনেক ইংরেজ-সৈন্য এবং ইংরেজের গুলিতে অনেক তিতুর অনুচর ধরাশায়ী হইয়াছিল। তিতু ঘোরতর যুদ্ধ করিতেছিল। কর্ণেল সাহেব এই সময় তিতুকে লক্ষ্য করিয়া গোলা ছুঁড়িলেন। চপলাপ্রভায় দিক্ উদ্ভাসিত করিয়া, মুহুর্ম্মুহু ধূম উদ্গীরণ করিতে করিতে, ধূমে দিক্ আচ্ছন্ন করিয়া, গোলা ছুটিল। মুহূর্ত্তমধ্যে গোলা তিতুর উপর নিপতিত হইল। গোলার আঘাতে তিতুর দক্ষিণ উরু উড়িয়া গেল। তিতু ভূতলে পতিত হইয়া নিমীলিত নেত্রে ফেনে দগার করিতে লাগিল। দেখিতে দেখিতে তাহার প্রাণবায়ু নিঃসৃত হইল। তিতুর সব ফুরাইল! উন্মত্তের উদ্ভট কল্পনার অবসান হইল!

গোলার আঘাতে তিতুর বাঁশের কেল্লা পড়িয়া গিয়াছিল। কেল্লা চাপা পড়িয়া তিতুর অনেক অনুচর আর্ত্তনাদ করিতে করিতে প্রাণ বিসর্জ্জন করিয়াছিল। অনেকে পলাইয়া গিয়াছিল। কেহ বৃক্ষের উপরে, কেহ গৃহস্থের অন্দরে, কেহ পাটের গুদামে, কেহ শস্যের ক্ষেত্রে আশ্রয় লইয়াছিল। নিকটে এক স্থান হইতে প্রচুর পরিমাণে মাটী কাটিয়া লওয়া হইয়াছিল। সেই স্থানে একটা প্রকাণ্ড গর্ত্ত ছিল। অনেকে সেই গর্ত্তে লুকাইয়াছিল। অতঃপর ইংরেজ সৈন্য গৃহে, প্রাঙ্গণে, বৃক্ষে, গর্ত্তে, ঘাটে, মাঠে, যেখানে যাহাকে পাইল, তাহাকে গুলি করিল। যাহারা বৃক্ষের উপর ছিল, তাহারা গুলি খাইয়া পাখীর মত ঝট্পট্ করিতে করিতে মৃত্তিকার উপর পতিত হইতে লাগিল। কত পলাইল, কত মরিল, তাহার ইয়ত্তা নাই।

অনেকেই বন্দী হইল। কর্ণেল সাহেব বন্দীদিগকে লইয়া

বারাসতে গমন করেন। বারাসতে বন্দিগণ খাইবার জন্য এক-ছটাক করিয়া চাউল পাইয়াছিল। বারাসত হইতে তাহারা আলিপুরে প্রেরিত হইয়াছিল। আলিপুরে তাহাদের বিচার হয়। ৩৫০ জন আসামীভুক্ত হইয়াছিল। বিচারে ১৪০ জনের কারাদণ্ড হয়। সেনাপতি মাসুমের প্রাণদণ্ড হইয়াছিল।[১১]

১১ ওকনালী সাহেবের "The Wahhabis in India" নামক প্রবন্ধে এইরূপ লেখা আছে। কেহ কেহ বলেন, আলিপুরের জজ ও কলেক্টর বন্দীদিগকে সঙ্গে লইয়া নারিকেলবেড়িয়া গ্রামে গিয়াছিলেন। সেখানে তিতুমীরের কেল্লার প্রাঙ্গণে এক সভা হইয়াছিল সে সভায় বহুগ্রামের বহু সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি উপস্থিত ছিলেন। তাঁহাদের সাক্ষ্য লইয়া বিচার হয়। বিচারে মাসুমের প্রাণদণ্ড, অনেকের দ্বীপান্তরদণ্ড এবং অনেকের কারাদণ্ড হইয়াছিল। নারিকেলবেড়িয়া গ্রামে তিতুর বাঁশের কেল্লার সম্মুখে মাসুমের ফাঁসি হইয়াছিল। আট শতজন বন্দী হইয়াছিল।

## পরিশিষ্ট

কলভিন্ সাহেব তিতুমীরের বিদ্রোহ সম্বন্ধে যে বিস্তৃত রিপোর্ট লিখিয়াছিলেন, গবরণমেণ্ট সেই রিপোর্ট পড়িয়া এইভাবে মন্তব্য প্রকাশ করিয়াছিলেন,—"এ বিদ্রোহ ব্যাপার স্বল্প স্থানমাত্র ব্যাপিয়াই হইয়াছিল ; যে স্থানে ইহার উৎপত্তি, তথা হইতে ইহা প্রসৃত হইয়া পড়ে নাই। দেশের সম্ভ্রান্ত, সক্ষম এবং সুবিজ্ঞ ও সুবিবেচক লোকে এ ব্যাপারে যোগ দেন নাই।"

গবরণমেণ্ট স্পষ্টই বলিয়াছিলেন যে, ইহা পাগলামীর কাজ ; যাহারা এ কাজ করিয়াছিল, তাহারা জানিত না, কি কাজ করিতেছি। ভারতের কোটি কোটি কণ্ঠ হইতে গবরণমেণ্টের এই কথাই প্রতিধ্বনিত হইবে। তিতু যে অপরাধ করিয়াছিল, তাহার ফল সে পাইয়াছিল। তিতুর পক্ষে যাহারা ছিল, তাহাদেরও শাস্তি হইয়াছিল। তিতুর পাপে, তিতুর পুত্রের দণ্ড হয় নাই। বরং গবরণমেণ্ট তাহার বৃত্তি ব্যবস্থা করিয়াছিলেন। এমন রাজার রাজ্যে যাহারা বিদ্রোহের কল্পনা করে, তাহারা প্রকৃতই পাগল,— তাহারা কৃপার পাত্র।

### তিতুর জীবনী কেন ?

তিতুর প্রসঙ্গ সাঙ্গ হইল। হিন্দু হউক, মুসলমান হউক, খৃষ্টান হউক, শিখ্ হউক, পারসিক হউক, তিতুর ন্যায় যদি কখনও কাহারও দুর্বুদ্ধি হয়, ভ্রান্তি হয়, তিতুর দৃষ্টান্তে নিশ্চিন্তই তাহার চৈতন্য হইবে। তিতু বড়ই দুর্বুদ্ধি ; তাই তিতু বুঝিল না, ইংরেজ কত ক্ষমাশীল,—কত করুণাময়। তিতুকে বাঁচাইবার জন্য ইংরেজ আত্মক্ষতি করিয়াছিলেন। যখন আলেকজান্দার সাহেব তিতুকে ধরিতে গিয়াছিলেন, তখন তিনি আপন সিপাহিদিগকে ফাঁকা আওয়াজ করিতে বলিয়াছিলেন। ফাঁকা আওয়াজ করিয়া অনেক সিপাহী মরিয়াছিল। তিতু না মরিয়া আপনি বশ্যতা স্বীকার

করে, ফাঁকা আওয়াজের ইহাই উদ্দেশ্য নহে কি? তিতু যখন ঘোর উন্মত্ত হইয়া উঠিয়াছিল, তখনও ইংরেজ-সেনাপতি তাঁহাকে বাঁচিবার অবসর দিয়াছিলেন। তখনও কামানে ফাঁকা আওয়াজ হইয়াছিল। হায়! দুর্বুদ্ধি তিতু,—অহমিকায় আত্মহারা তিতু, ইংরেজের সে করুণা, সে মমতা, বুঝিল না। বুঝিল না,—তাই তিতু আপনি মজিল,—আর সহস্র সহস্র লোককে মজাইল।

এ ভারতে ইংরেজের রাজত্বে ইংরেজের করুণার মর্ম্ম, ইংরেজের বাৎসল্যের ভাব, কে না বুঝে? ইংরেজের রাজত্বে সুখামৃতের নিত্য সুখাস্বাদ কে না করে? তবে সুপিতার দশটী পুত্র থাকিলে, কাহারও কাহারও দুর্বুদ্ধি ঘটিবার সম্ভাবনা থাকে ত। ইংরেজ-রাজের ভারত-রাজত্বে কোটি কোটি প্রজার মধ্যে কাহারও হয় ত কখন কু-কল্পনার আবেশ হইতে পারে। কখন কখন এইরূপ কল্পনাবেশের বিকাশ কোন্ না দেখা যায়? তাহাদের চৈতন্য উদ্রিক্ত করিবার জন্য, আর ভবিষ্যৎ-কুলাঙ্গারদিগকে সতর্ক করিবার জন্য, তিতুর জীবনী প্রকাশিত হইল।

সমাপ্ত